"জয় জগদ্বন্ধু"

শ্রীশ্রীচন্দ্রপাতমাধুর্য্য বিন্দু।

মহানাম-ভিক্ষু

যতিচ্ছন্ন মহেন্দ্র

প্রণীত।

ত্বরিত পদাশ্রিত অনেক ভক্ত বিরচিত

"শ্রীমহানাম মধুভাষ্য"

সমলঙ্কৃত।

শ্রীঅঙ্গন-দুলাল গ্রন্থাগার

শ্রীশ্রীমহানাম সম্প্রদায় সেবক

মহানাম ব্রত দাস কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

পোঃ শ্রীঅঙ্গন
ফরিদপুর

শ্রীহরিপুরুষাব্দ
১৩৩৮
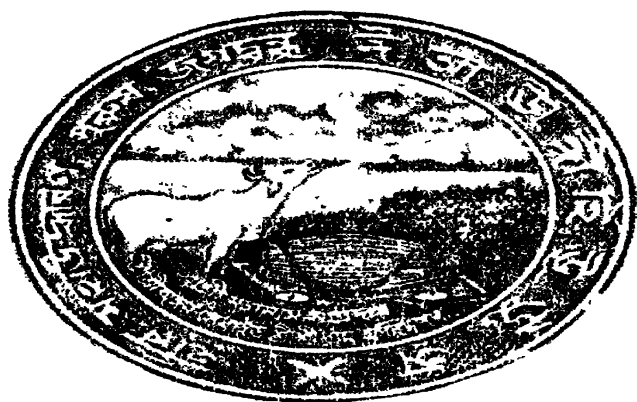
নিবেদন।

সে আজ ছয়-সাত বছর আগেকার কথা। 'মহাউদ্ধারণ' পত্রিকার স্তম্ভে "চন্দ্রপাত-মাধুর্য্য বিন্দু" শীর্ষক একটি কবিতা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তখন ভাবি নাই, কোনও-কালে এই মুগ্ধতার শতাংশও ভাষায় ফুটাইয়া তুলিতে পারিব। আজও নিজের বুদ্ধির জোরে নয়, কেবলমাত্র কৃপাশক্তি আশ্রয় করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। সমাপ্ত করিয়া মনে হইতেছে, কিছুই যেন লিখিতে পারি নাই, কোটীকল্প লিখিলেও বুঝি শেষ হইবে না।

এ গেল আমার ব্যক্তিগত কথা। কিন্তু বান্ধবগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন স্বয়ং প্রভুর এত মহাগ্রন্থ থাকিতে আমরা 'চন্দ্রপাত মাধুর্য্য বিন্দু' পাঠ করিব কেন? আর সাক্ষাৎ শ্রীলেখনী-প্রসূত চন্দ্রপাত ত্রিকালগ্রন্থ ও হরিকথা থাকিতে আমি জীবাধমই বা কেন চন্দ্রপাত মাধুর্য্যবিন্দুর টীকাভাষ্য প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছি। এর উত্তর আমাকে দিতেই হইবে।

এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রতিনিয়ত আমাদের চক্ষের উপর প্রকাশিত রহিয়াছে, এ'ছাড়া যেমন আর একটি জগৎ আছে তাকে বলে অন্তর্জ্জগৎ—নয়ন খুলিয়া তাহা দেখা যায় না, নয়ন মুদিয়াই তাহা অনুভব করিতে হয়; ঠিক তদ্রূপ,

শ্রীহরি যখন লীলায় আসেন তাঁহার প্রত্যেকটি কার্য্যের দুইটী দিক্ থাকে। বাহিরের দিকটিকে বলে 'লীলা'—তাহা রসিক ভক্তের আস্বাদনীয়, আর অন্তরের দিকটিকে বলে 'তত্ত্ব'—তাহা ভাবুকের অনুভবগম্য।

'সুবল মিলনের' গৌরচন্দ্রিকা বর্ণিতে গিয়া আমার প্রভু যখন শ্রীহরিকথায় লিখিলেন,—

'গৌরীদাস সনে, প্রাণ গৌরাঙ্গ সুন্দর।
রা-রা রাধা বলিতে পুলক কলেবর॥'

তখন রসিক ভক্ত ঐ গৌর-গৌরী মিলন মাধুরী নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লয়। কিন্তু শেষে যখন,

'গুপত গৌরাঙ্গ লীলা মুগ্ধ বন্ধু ভনে
(গুপ্তও নয়রে) (জীব-উদ্ধারণ মাত্র)
(খোল করতাল পাত্র)'

—লিখিয়া প্রভুবন্ধু ক্ষান্ত হইলেন, তখন কেবল-রসবেত্তা তাহা আর আস্বাদন করিতে পারেন না। তত্ত্বপিপাসু ভাবুক তখন নয়ন মুদিয়া ঐ গুপ্ত নয় অথচ গুপ্ততত্ত্ব অনুভব করেন। শ্রীল শুকদেব তাই—

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ'

—বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত রস পানে তাঁহাদিগকেই ডাকিয়াছেন, যাঁহারা একাধারে রসিক এবং ভাবুক। বাহিরে 'রস', ভিতরে 'তত্ত্ব' এই দুই লইয়া রসরাজের লীলামাধুরী। সুরধুনীর

তীর ধরিয়া কীর্ত্তন-রস রসিয়া গোরাচাঁদ আমার প্রিয়অঙ্গ অঙ্গীকারে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছেন—দেখিয়া হৃদয় আনন্দ-রসে ভরিয়া আসে, কিন্তু যাবৎ—

'একে পঞ্চ দশমী সন্তাপে'

(এই রহস্য মা) (এই জীব উদ্ধারণ)

এই তত্ত্ব রহস্যের মর্ম্মভেদ না হয় তাবৎ ষোল আনা পরিতৃপ্তি ঘটে কই ?

শ্রীশ্রীমহাউদ্ধারণচন্দ্রের লীলা ও তত্ত্ব দুইই এবার শ্রীশ্রীপ্রভু স্বয়ং নিজ শ্রীহস্তে লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা এমনই দুরূহ ও রহস্যময় করিয়া রাখিয়াছেন যে এপর্য্যন্ত কেহ তাহার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন নাই। আজ 'চন্দ্রপাত মাধুর্য্যবিন্দু' বন্ধুর মহাগ্রন্থ সমূহের ভিতরের দিক অর্থাৎ তত্ত্বাংশ ব্যক্ত করিয়াছে, কিরূপে তাহা বলিতেছি ;—

শ্রীশ্রীপ্রভুর স্বরচিত মহাগ্রন্থ যতখানিই বলিনা কেন, মূলতঃ তত্ত্বগ্রন্থ একখানি। তাহা শ্রীশ্রীত্রিকালগ্রন্থ। কারণ হরিকথা ও চন্দ্রপাতের লীলার বর্ণনাংশ বাদ দিলে মূল তত্ত্বাংশ যেটুকু পাই তৎসমুদয় সূত্রাকারে ত্রিকালগ্রন্থেই পরিদৃষ্ট হয়। ত্রিকাল-গ্রন্থ তত্ত্বের বারিধিস্বরূপ, "চন্দ্রপাত মাধুর্য্য বিন্দু" যেন তাহার মন্থনে উদ্ভূত অমৃত।

কোনও নবাগত ব্যক্তি প্রথমবার ত্রিকাল-গ্রন্থখানি খুলিয়া পাঠ করিলে কি মনে করেন। কখনও মনে করেন প্রলাপোক্তি, কখনও মনে করেন হেয়ালী, কখনও মনে

করেন খেয়াল, আবার কখনও বা কিছুই ঠিক করিতে পারেন না ; কিন্তু স্থির হৃদয়ে বহুবার আলোচনা করিলে দেখা যায়—প্রভুর কিছু প্রাণের কথা বক্তব্য আছে, তাহা অতি অভিনব তত্ত্ব। প্রত্যেকটি সূত্র মূল বক্তব্যকে কেন্দ্র করিয়াই লিখিত হইয়াছে।

সমগ্র গ্রন্থমধ্যে মূল চারিটী মাত্র প্রভুর প্রাণের বক্তব্য বিষয়। তিনটী সূত্রে সেই তত্ত্ব চতুষ্টয় অতি সুনিপুণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রথম কথা **'হরি তত্ত্ব'**। 'হরি-পুরুষ' এই সূত্রে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা **'হরিনাম তত্ত্ব'**, তৃতীয় কথা **'জগদ্বন্ধু তত্ত্ব'**। "হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু" এই একটীমাত্র সূত্রে ঐ দুইটী তত্ত্বকথা পরিব্যক্ত করিয়াছেন। চতুর্থ কথা **"জগদ্বন্ধু নামের তত্ত্ব"**। "মহা-নামের আদিনাম জগদ্বন্ধু নাম" এই সূত্রে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে।

"চন্দ্রপাত মাধুর্য্য বিন্দু" এই তিনখানি মহাতত্ত্বময় মহা-বাক্যের বিশ্লেষণ বই আর কিছুই নহে। **'হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু'** এই সূত্রের মর্ম্ম লইয়া মাধুর্য্য-বিন্দুর উপক্রমণ। **"হরি পুরুষ, উদ্ধারণ প্রকৃতি"** এই সূত্রের তাৎপর্য্য লইয়া প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃষ্টি। তারপর মহানাম তত্ত্ব লইয়া মাধুর্য্যবিন্দুর পরিপুষ্টি, অবশেষে চন্দ্রপাতের ফল ও হেতু লইয়া উপসংহার ; অতএব 'চন্দ্রপাত মাধুর্য্য বিন্দু' মহাউদ্ধারণ লীলার অন্তরের দিক বা মহাতত্ত্বের দিগ্‌দর্শন।

লীলাত্রয়ের যাহা দার্শনিক ভিত্তি তাহা এই কবিতায় পরিব্যক্ত। শ্রীশ্রীপ্রভুর মহাবাণী ও রচনাসমূহ দেখিলে পূর্ব্বে মনে হইত, কতকগুলি মনোমুগ্ধকর সুন্দর সুগন্ধি কুসুম এলো-মেলো ছড়ান রহিয়াছে। এখন চন্দ্রপাত মাধুর্য্য-বিন্দুর বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিয়া মনে হয়, একটি অপ্রাকৃত মালা কত শৃঙ্খলায় কত নিপুণতায় কোন্ চতুর মালী নিরালা নির্জ্জনে বসিয়া সযতনে গাঁথিয়াছে, আর মনে হয় কবে জগজ্জীবের কণ্ঠে হার হইয়া এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব-মালিকা দুলিবে। তাহাই ভাবিতে ভাবিতে মহানাম মধুভাষ্য প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছি। দুরধিগম্য ত্রিকাল চন্দ্রপাত, তাহাতে প্রবেশ করিতে পারি না। তাই পরমাধিকারী ভক্তের হৃদয়ে তাহা যেমন প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই আস্বাদন করি। উজ্জ্বল সূর্য্যের কিরণের দিকে তাকাইতে পারি না। তাহাই যখন চন্দ্রের উপর পতিত হয়, তখন তাহার স্নিগ্ধতাটুকু লইয়া নয়ন জুড়াই। ভক্ত-ভুক্ত-শেষ, তাই মহামহাপ্রসাদ জানিয়া মাথায় তুলিয়া লইয়াছি। "চন্দ্রপাতমাধুর্য্য বিন্দু" প্রভুর সকল সূত্রের সূত্র। তত্ত্বাতীত তত্ত্ব বন্ধুসুন্দরকে আস্বাদন করিবার এই মূলসূত্র বা মুখ্য অবলম্বন। আমি ভাষ্যে তাহার তাৎপর্য্য কিঞ্চিন্মাত্র ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এই ভাষ্যে কোনও ভক্ত-প্রাণ চন্দ্রপাত বা ত্রিকালগ্রন্থের কোনও সূত্রের আক্ষরিক অর্থ অনুসন্ধান করিয়া হতাশ হইবেন না, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা মহাগ্রন্থ সমূহের অর্থ

নহে, অর্থের তাৎপর্য্য ; বাহিরের দিক নহে, ভিতরের দিগদর্শনী। ইহা ধারাবাহিক টীকা নহে, গূঢ়ার্থ প্রকাশিণী। আমি সে গূঢ়ার্থ বুঝিবার যোগ্য পাত্র নহি তথাপি যাহার ইচ্ছা মূককে বাচাল করে তাঁহার ইচ্ছাতেই বাচালতা করিয়াছি। এই মাধুর্য্য বিন্দু যাঁহার লেখনী প্রসূত তাঁহারই কাছে জানিতে চাহিয়া ছিলাম, 'দাদা' এমন রহস্যময়ী কবিতা তুমি কবে কেমন করিয়া লিখিলে ?' প্রাণারাম দাদা আমার নিজ হস্তে চিঠির উত্তর দিয়া জানাইয়া ছিলেন,—

"ত্রয়োদশ দশার কয়েকদিন পূর্ব্বে সেবকদের নিকট হইতে শ্রীচন্দ্রপাত গ্রন্থখানা লইয়া 'আয় তোকে মন্ত্র প'ড়ে ঝে'ড়ে দি' ব'লে সর্ব্বাঙ্গে হস্ত বুলাইয়া শ্রীচন্দ্রপাতের আগা গোড়া পাঠ করি ; পরে, এ কটমট তো বুঝ্তে পারি না, বুঝতে পারবো তো এইরূপ বলায় সহাস্যাননে মৃদু মধুর কণ্ঠে প্রভু তখনই বলিলেন ; "পারবে"। পরে, শ্রীশ্রীমহানাম-যজ্ঞ আরম্ভ হইবার কয়েক বৎসর পর একদিন সান্ধ্য আরত্রিকের সময় শ্রীশ্রীপ্রভুর মহালীলার বিলাস-বাসরের পার্শ্বে ধূলি-বিলুণ্ঠিত ভাবে যখন সকাতরে কাঁদিতে 'কাঁদিতে নিবেদন করিলাম যে, 'বন্ধু, তুমি তো বলেছিলে চন্দ্রপাত বুঝতে পারবো, কিন্তু কই এতদিন গেল উহার

মর্ম্ম উদ্ধার তো হ'ল না।' এরূপ করুণ প্রার্থনা করবার পর হঠাৎ এই "চাঁদমণি বন্ধু শ্রীহরি অম্বর" স্ফুরণ হইতে লাগিল। আরত্রিকের পর "চন্দ্রপাত মাধুর্য্য বিন্দুর পরশ স্পন্দনে এই "পঞ্চপুষ্প' ফুটিয়া উঠিল ॥"

দাদা 'পঞ্চ পুষ্প' অর্থে কি বুঝিয়াছেন বুঝিতে পারি নাই বোধ হয় কবিতার পাঁচটি স্তবক (Stanza) বুঝিয়াছেন সে যাহা হউক, মাধুর্য্য বিন্দুর পরশে যে স্পন্দন খেলিয়াছে, তাহাতেই যে ফুল ফুটিয়াছে; 'লিখিব' ভাবিয়া কলম হাতে লইয়া গবেষণা করিয়া যে লিখেন নাই, তাহাতো স্পষ্টই রহিয়াছে। আমি জীবাধম সে স্পন্দন অনুভব করি নাই, কেবল পঞ্চপুষ্পের গন্ধেই আকৃষ্ট হইয়াছি। পাঠ করিয়া কে কতটুকু পরিতোষ লাভ করিবেন বা না কবিবেন ভাবিয়া কিছু লিখি নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় আমাকেও কহিতে হইবে;

"প্রভুর যেই আচরণ,
তাহা করি বর্ণন—
সর্ব্ব চিত্ত নারি আরাধিতে।"

যাহা প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া অনুভব করাইয়াছেন তাহাই লিখিয়াছি। সর্ব্বচিত্ত আরাধনা করিবার অভিলাষ ছিল না। তবে বান্ধববর্গের শ্রীচরণে প্রার্থনা এই যে সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া পাঠ করিবেন; শেষে গ্রহণ করুণ বা পরিহার করুণ

সে আপনার ইচ্ছা বা অনুগ্রহ কিন্তু পড়িবার কালে সহৃদয় হইবেন ইহাই প্রার্থনা।

আর একটী কথা এই যে শ্রীশ্রীপ্রভুর মহাগ্রন্থরাজি আমাদের পরম আদরের বস্তু। স্বয়ং উঁহাকে 'উদ্ধারণ ও মহাউদ্ধারণ' বলিয়াছেন ও মুখস্থ করিয়া রাখিতে আদেশ করিয়াছেন। যাঁহারা প্রভুগতপ্রাণ, ঐ সমুদয় গ্রন্থ তাঁহাদের কণ্ঠহার, ইহা ধরিয়া লইয়াই আমি ভাষ্য রচনা করিয়াছি। বস্তুতঃ যাঁহাদের ঐ সকল গ্রন্থ সম্যক্ আলোচনা করিবার সুযোগ হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে যথাযথভাবে ভাষ্যের অনুসরণ করা একটু অসুবিধা জনক হইতে পারে। সেজন্য আমি দোষী বটে, কিন্তু নিরুপায়।

যখন ভাষ্য লিখিতে ব্রতী হই, তখন ভাবি নাই যে ইহা কোনদিন গ্রন্থাকারে বান্ধববৃন্দের করে তুলিয়া দিবার সৌভাগ্য লাভ করিব। লিখিয়াছি,—মনের আনন্দেই লিখিয়াছি। আজ পরম ভক্তপ্রাণ আমার এক স্নেহময় দাদা যাবতীয় ব্যয়ভার ও কষ্টভার নিজে বহন করিয়া ইহার মুদ্রণকার্য্য সমাধা করাইয়া দিলেন। দাদা আমার গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া দিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার নামটি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। "দিও নই নিওনা" আমার প্রভুর শ্রীমুখের একটি উপদেশ। দান করিয়া প্রতিদান স্বরূপ স্বার্থসিদ্ধি অভিলাষ করেন না, এমন বহু দেখিয়াছি কিন্তু বিনিময়ে যে সামান্য দু'কথা প্রশংসাও প্রত্যাখ্যান করেন, এমন ভক্তপ্রভু এই প্রথম

দেখাইলেন। তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাই ধন্যবাদ জানাইতেও বিরত রহিলাম। প্রাণারাম প্রভুবন্ধু তাহার কল্যান করুণ। চন্দ্রপাতের কিরণ সম্পাতে তাহার হৃদয় শান্ত স্নিগ্ধ হউক। অন্তরে অন্তর্য্যামী দেবতার পায়ে এই প্রর্থণা করি।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের শুভ জন্মোৎসব সন্নিকট। তাই অতি ব্যস্ততার সহিত মদ্রণ কার্য্য সমাধা হইল। অধিকন্তু নানা প্রয়োজনানুরোধে মুদ্রণকালে প্রেসে উপস্থিত হইয়া যাবতীয় কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে না পারায় স্থানে স্থানে মুদ্রণ-প্রমাদ থাকিবারই সম্ভাবনা। ভাবগ্রাহী বান্ধবগণ 'বিষ্ণায়' বা 'বিষ্ণবে' লক্ষ্য না করিয়া মর্ম্মগ্রহণ করতঃ স্বীয় ঔদার্য্যগুণে জীবাধম লেখককে ক্ষমা করিবেন। ইহাই সবিনয় নিবেদন। অলমিতি।

সবান্ধবশ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের
জয় হউক।

মূঢ়—

শ্রীশ্রীহরিপুরুষাব্দ—৬০ ভাষ্য লেখক।
১লা বৈশাখ—১৩৩৮। মহাউদ্ধারণ মঠ, কলিকাতা।

"জয় জগদ্বন্ধু"

চন্দ্রপাত মাধুর্য্য বিন্দু।

চাঁদমণি বন্ধু শ্রীহরি অম্বর,
সুমাধুর্য্য সুভগ চুষী কাদম্বিনী।
প্রথম অমৃত বৃষ্টি রসগোরী,
ধ্রুবতারা নিতাই ভাব নিছনী॥

দ্বিতীয়ামৃত বৃষ্টি বংশী আলাপ,
নন্দের বালা শ্রীলালতা পদ্মিনী।
উদ্ধারণে শৈব্যা বিগ্রহ কমন,
জড়িত রাধা মহাভাব দামিনী॥

তৃতীয়ামৃত বৃষ্টি ধামত্রয়,
মহানাম, অমিয়-সাগরমেখলা।
কীর্ত্তন কল্লোল রোল মহারোল,
নাইকো কটূক্তি তিক্ত কেলিকিলা॥

তীরে কীট যত স্রষ্টা সৃষ্ট শত,
কেবল ও কুহক ঐশ্বর্য্য দ্বন্দ্ব।
করুণেক্ষণে বন্যা সুধাঘন।
চন্দ্রপাত শীতল অমৃতচ্ছন্দ॥

সে লাবণী উচ্ছ্বাসে কীটমোক্ষণ,
তাই মাটীতে চাঁদ উদয় ভেল।
আব্রহ্মস্তম্ব ভাবরাগ রঞ্জিত,
মহীন্দির যে কীট সে কীট শেল॥

ইতি শ্রীচন্দ্রপাত মাধুর্য্যবিন্দু সমাপ্ত॥

অথ শ্রীমহানাম মধুভাষ্যম্।

বন্দনা

বন্দে বন্ধুং সুধা-সিন্ধু-সন্দোহানন্দ-মন্দিরম্।
তল্লীলাকৃষ্ট চিত্তেভ্যশ্চকোরেভ্যো নমোনমঃ॥
নত্বা গুরুং শিশুরাজং শিশুরস-সুরসিকম্।
বান্ধবাংশ্চ প্রণিপত্য বন্ধু সুন্দরমাশ্রয়ে॥

মহানাম-সম্প্রদায়ং পতিতৈক সমাশ্রয়ম্।
তদাশ্রয়াদযোগ্যোঽপি লীলাসিন্ধৌ নিমজ্জতি॥
বৈদুষ্যহীনস্যৈতস্য মূঢ়স্য মে বিচেষ্টিতম্।
হীনেম্বধিককৃপস্য বন্ধোঃ কৃপা-নিদর্শনম্॥

মমাপি চিরমজ্ঞাতং সিদ্ধান্তং যদভিনবম্।
ব্যক্তমত্র কৃতং সর্ব্বং লেখনীরূপেন ময়া॥
ন জানে কস্যচিদপি সুখায়ৈতদ্ভবেন্নবা।
যন্ত্রিণঃ করসংস্থিতযন্ত্রবন্মেঽকর্ত্তৃতা॥

শ্রীচন্দ্রপাত মাধুর্য্যমতুলতমং শম্ভুশেষাদ্যগম্যম্
স্বাস্বাদ্যং শ্রীলবান্ধবজননিকরৈঃ শ্রীজগদ্বন্ধুভক্তৈঃ।
বিন্দোস্তস্য প্রকাশেষু নিপুণকরং তত্ত্বমাধুর্য্যসিন্ধোঃ
মদ্‌গুরুং শ্রীযুতং শিশুরসিকমহং শ্রীমহেন্দ্রাখ্যমীড়ে॥

শ্রীহরি গগম্পরিত শোভিতম্,
শ্রীবন্ধু-শশাঙ্কং মৃগাঙ্ক-বিগতং।
সুমধুর-চুষী-রসেন রসালম্,
দর্শয় হে গুরো! জলদান্তরালম্॥

শ্রীমহানাম মধুভাষ্য।

অনঘ শ্রীলীলাপুরুষোত্তম অঘরূপী অঘাসুর মথণ করিয়া প্রাণপ্রিয় সখাগণকে মুক্ত করিয়া লইলেন। অজগর মূর্ত্তি ধরিয়া অঘাসুর সকল গোপ বালকগণকেই গ্রাস করিয়াছিল। এতক্ষণ অজাগরের উদরে থাকিয়া থাকিয়া বালকগণ অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণা পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। লীলাকৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, সখাগণ! বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। সকলেই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। এখন আমরা কিছু আহার করিয়া লই। অই যে অতিরম্য পুলিন দেখা যাইতেছে, ওখানে আমরা বসিব! ঐ দেখ সরসী জলে কত রাশি রাশি পদ্ম ফুটিয়াছে। গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অলিকুল উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে।

বিহঙ্গম কুল নানা ছন্দে রাগিণী তুলিয়াছে। তাহাদের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে কাননস্থ তরুরাজি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ওখানে আমাদের আহারীয় কিছু অবশ্যই মিলিবে।

অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ
স্বকেলি সম্পৎ মৃদুলাচ্ছবালুকম্।
স্ফুটৎসরোগন্ধ হৃতালি পত্রিক
ধ্বনি প্রতিধ্বান লসদ্দ্রুমাকুলম্ ॥৫
অত্র ভোক্তব্যমস্মাভির্দিবারূঢং ক্ষুধার্দ্দিতাঃ।
বৎসাঃ সমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্তু শনৈকৈস্তৃণম্ ॥

৬।১৩।১০

শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে বালকেরা ভাল ভাল বলিয়া উঠিল ও বন্ধনরজ্জু মোচন পুরঃসর গোবৎসগণকে ছাড়িয়া দিয়া প্রাণসখার সঙ্গে ভোজনে প্রবৃত্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থলে উপবেশন করিলেন। শতদলের প্রত্যেকটী দল যেমন কর্ণিকার অভিমুখে থাকে তদ্রূপ সকলেরই হাস্যময় বদন কমল শ্রীকৃষ্ণকর্ণিকার অভিমুখে রহিল।

সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজুঃ
ছদা যথাম্ভোরুহ কর্ণিকায়াঃ ॥৮।১৩।১০

কেহ ফুলের পাঁপড়ি ছিঁড়িয়া লইল, কেহ বৃক্ষপল্লব ভাঙ্গিয়া লইল, কেহ গাছের ছাল খসাইয়া লইল, কেহবা প্রস্তরখণ্ড কুড়াইয়া স্বস্ব ভোজনপাত্র করিয়া লইল, আর প্রাণ-কানাইয়া

মধ্যস্থলে বসিয়া নিজের বেণুটী উদর ও কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া বগলের মধ্যে শৃঙ্গ ও পাচনী রাখিয়া বামকরে দধিমিশ্রিত অন্নের গ্রাস ও সুস্বাদু ফল সকল লইয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা হাসিতে হাসিতে একবার নিজমুখে আর একবার সখাগণের মুখে পুরিয়া দিতে লাগিলেন। স্বর্গবাসী দেব ঋষিগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরমানন্দে জগৎপতির এই অপূর্ব্ব ভোজন-লীলা দর্শন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ—

বৎসাস্ত্বন্তর্বনে দূরং বিবিশুস্তৃণলোভিতাঃ।

গোবৎগণ বিচরণ করিতে করিতে তৃণ লোভে দূরবর্ত্তী একটি বন মধ্যে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে বৎসপালগণ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের ভোজনানন্দের বিঘ্ন উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, বয়স্যগণ! তোমরা কেহ ভোজন হইতে বিরত হইও না। নিরুদ্বেগচিত্তে আহার কর। এই যে আমি এখনই বৎসগণ লইয়া আসিব।

'মিত্রাণ্যাশান্মাবিরমতে হানেষ্যে বৎসকানহম্'

এই কথা বলিতে বলিতে ঐ দধিম্রক্ষিত অন্ন খাইতে খাইতেই উধাও হইয়া ছুটিলেন তারপর বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া বৎসানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সমস্ত পর্ব্বত, পর্ব্বত-গুহা, লতাচ্ছন্ন বিবর সমূহ, তন্ন তন্ন করিয়াও বৎসগণের কোন খোঁজ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কালাচাঁদ বিষণ্ণ বদনে পুলিনে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে আসিয়া যাহা

দেখিলেন তাহাতে আরও বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। দেখিলেন সখাগণ কেহই নাই। কোথাও কোনদিকে তাহাদের সাড়াটী পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না। বিশ্ববিৎ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন, এসব ব্রহ্মার কাণ্ড। পঙ্কজ বদনে মৃদু মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। ভাবিলেন, যদি বৎস ও সখাগণকে এখন খুঁজিয়া আনয়ন করি তবে তো পিতামহ ঠাকুরের কোন শিক্ষাই হয় না, আর যদি ইহাদিগকে সঙ্গে না লইয়া গোকুলে প্রবেশ করি তবে—জননীগণের বিষাদের পরিসীমা থাকিবে না। অতএব কি করিয়া উভয় দিক রক্ষা হয়; রঙ্গনটরাজ তখন একটি পরম অপূর্ব্ব লীলা করিলেন,—

> যাবদ্বৎসপবৎসকাল্পকবপু যাবৎ করাঙ্ঘ্র্যাদিকম্
> যাবদ্ যষ্টি বিষাণ বেণুদল শিগ্ যাবদ্বিভূষাম্বরম্।
> যাবৎ শীলগুণাভিধাকৃতি বয়ো যাবদ্বিহারাদিকং সর্ব্বম্।
> বিষ্ণুময়ং গিরোঽঙ্গ বদজঃ সর্ব্বস্বরূপো বভৌ ॥১০।১৩।১০

অর্থাৎ ধবলী শ্যামলী প্রভৃতি সকল বৎসগণের ও শ্রীদামাদি সকল সখাগণের যার যেরূপ ছোট বড় অঙ্গের আয়তন, যার যেরূপ হস্তপদাদির গঠন, যার যেরূপ শিঙ্গা বেণু ও গাভীর দড়ি, যার যেরূপ চরিত্র, গুণ হাবভাব আহার বিহার ও গতি ভঙ্গী, সর্ব্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবিকল তৎ তৎরূপ হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে ব্রজপুরে প্রবেশ করিলেন। এই ভাবে একটি

বৎসর অতিবাহিত হইল। তাৎকালীন শ্রীব্রজের লীলা-মাধুর্য্য শ্রীল শুকগোসাঞি পরম চিত্ত চমৎকারী ও ভক্তজন হৃদয়গ্রাহী করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীশুক বলিয়াছেন—'সর্ব্বময় শ্রীকৃষ্ণ' এতদিন একটা কথার কথা মাত্রই ছিল—ভাষাতেই তাহা দেখিয়াছি, আজ ব্রজমণ্ডলে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। আজ সারাটী ব্রজ কৃষ্ণময়। মাঠে ঘাটে, গোঠে গোঠে, বিপিনে কান্তারে, গৃহে প্রান্তরে, সর্ব্বত্র একই কৃষ্ণ। নিজেই নিজের দুগ্ধ পান করিতেছেন, আবার নিজেই নিজেকে নিবারণ করিতেছেন। নিজেই নিজেকে আয় আয় বলিয়া ডাকিতেছেন, আবার নিজেই নিজেকে গলায় রজ্জু বাঁধিয়া টানিয়া মাঠে লইয়া যাইতেছেন, নিজেই নিজের বেণুস্বরে মুগ্ধ হইয়া উর্দ্ধকর্ণে ছুটিয়া আসিতেছেন। নিজেই নিজের অঙ্গ চাটিয়া অপার আনন্দ পয়োধিনীরে নিমগ্ন হইতেছেন। আজ সকল গোপ রমণীর অঙ্কদেশ উজ্জ্বল করিয়া একই কৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন। আজ সকল ঘরে একই শ্রীকৃষ্ণ ভার ভাঙ্গিয়া নবনী লুটিতেছেন। প্রভাতকালে একই শ্রীকৃষ্ণ জননীগণের নিকট হইতে নিজেকেই নিজে ডাকিয়া লইয়া গোঠের পথে ছুটিতেছেন, আর গোঠের মাঝে নিজেকেই নিজে রাখাল রাজা সাজাইয়া নিজেকে ঘিরিয়া নিজেই নাচিতেছেন। এইখানেই লীলার চমৎকারিত্ব, ইহাই লীলার বৈশিষ্ট্য, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলাকলার ইহাই নিগূঢ় মাধুর্য্য।

এক তিনি, তাহাতে অনন্তানন্ত ভাবসমুদ্র অন্তর্নিবিষ্ট। কখনও আপনাতে আপনি রহিয়া বিভোর রহেন, কখনও নিজ হ'তে নিজেকে পৃথক্ করিয়া স্বীয় রসমাধুর্য্যাস্বাদনে ডুবিয়া থাকেন। একক ছিলেন, দুই হইয়া কুঞ্জকাননে কেলিরসে মাতোয়ারা হইয়া নাচিলেন। আবার এক হইয়া সুরধুনীকুলে রা রা বলিয়া কাতরকণ্ঠে কাঁদিলেন। সহস্রমূর্ত্তি হইয়া রাসমণ্ডলে রসের উৎস ছুটাইয়া দিলেন। আবার পঞ্চে পঞ্চ হইয়া গৌড়মণ্ডলে প্রেমের সিন্ধু উছলাইয়া দিলেন। একবার রথাগ্রে দারুব্রহ্ম দর্শন করিয়া অঝোরনয়নে অশ্রুবর্ষণ করিয়া ধরণীর বক্ষ পঙ্কিল করিলেন, আবার তারই সঙ্গে চিরমিলনে মিলিয়া বিরহাকুল ভক্তকুলকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া দিলেন।

এই আকর্ষণ আর বিকর্ষণ, ইহাই প্রেমের খেলা। এই সংশ্লেষণ আর বিশ্লেষণ, ইহাই মধুর মাধুর্য্য ; এই আস্বাদন আর সংগোপন, অনন্ত বিশ্বপতির ইহাই সাধের লীলা-কৌতুক। কেহ জানে না, কেহ জানিতে পারে না কেবল নিজেই জানেন, আর যাহাকে জানান সেই জানে। কখনও বা যোগমায়ার আবরণে নিজেও জানেন না, বা জানিতে চাহেন না বা জানিয়াও না জানার মত থাকিয়া মজার খেলা খেলেন। অধিক কি, স্বয়ং যিনি অনন্ত, তিনিও মুগ্ধ। রসিক-ভক্ত শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর রসের ভাষায় কহিয়াছেন ;—

'নাগ বলি যায় বেগে সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না দেয় কূল অধিক অধিক বাঢ়ে॥'

এক বৎসর পূর্ণ হইবার পাঁচদিন মাত্র বাকী আছে। অনন্ত মুর্ত্তি বলাই দাদা পর্য্যন্ত এযাবত টের পান নাই, যে তাহার প্রাণ কানু এতটা দিন ধরিয়া এমন এক মজার খেলা খেলাইতেছেন।

একদিন একটি ব্যাপার দেখিয়া একটু চিন্তার মধ্যে পড়িলেন। ভাবিলেন,কানাই আমাদের প্রাণের প্রাণ। কানাইকে যত ভালবাসি, সেরূপ আর কাহাকেও কোনদিন ভালবাসি নাই। কিন্তু আজ কয়দিন যাবত দেখিতেছি, সকলের প্রতিই প্রাণের টান সমান হইয়া পড়িতেছে। শুধু আমার নহে, সমস্ত ব্রজবাসীরাই কানাইকে নিজ নিজ পুত্র অপেক্ষা অধিক-তর স্নেহ করে, কিন্তু কিছুদিন যাবত লক্ষ্য করিতেছি, সকলের প্রতিই প্রীতি সমভাবে প্রবহমানা।

ইহার হেতু কি? একি কোন অসুরের বা দেবতার মায়া? না তাহাও তো সম্ভবে না, কারণ বলদেবকে মুগ্ধ করিতে পারে এমন কোন মায়াও তো ব্রহ্মাণ্ডে থাকিতে পারে না। তবে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের মায়া হইবে।

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বানার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥ ৩৪।

এইরূপ চিন্তা করিয়া বলদেব প্রাণকানাইয়ার কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপবধূবিট শঠ-শিরোমণি দামোদর তখন

দাদার প্রেমময় নেত্রটি খুলিয়া দিতে যোগমায়াকে ইঙ্গিত করিলেন। বলাই দেখিলেন,—

'সমস্তই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ।'

আজ অনন্তানন্তময় পরমাতিপরম তত্ত্বাতীত মহাতত্ত্বস্বরূপ শ্রীশ্রীবন্ধুচন্দ্রের সুস্নিগ্ধ কৃপালোকে স্নাত হইয়া পরম রসজ্ঞ একটি সুচতুর ভক্ত শ্রীশ্রীচন্দ্রপাতের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে করিতে প্রাকৃত প্রপঞ্চের পরপারে অপ্রাকৃত অভিনব রাজ্যের সর্ব্বশেষ সেই অনাদির আদি তত্ত্বের চরমবিন্দুতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানে গিয়া দেখেন কেহই নাই বা কিছুই নাই—কেবলমাত্র একটি অফুরন্ত মাধুরী ধারা। অনন্ত অক্ষৌহিণী সংসারের অগণিত জীবকুল, অসংখ্যেয় বিরাট তুরীয় ব্রহ্ম পরমাত্মা কেহ তাহা জানে না! কোথা হইতে যে ধারা পাত হইতেছে, কেহ তাহা বোঝে না—বুঝিতে পারে না, কারণ তিনি বোঝান না। ভক্ত তাহাকে জানিতে চায়, তিনি ধরা দেন না,—ধরা দিবেন না। ভক্ত ভাবে, আমি তাহাকে ধরিবই। সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে ভক্ত ভগবানের এই লুকোচুরি খেলা চলিতেছে।

কত শতকোটী জন তাহাকে জানিতে চেষ্টা পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সে গুপ্ত মাধুরী কেহ জানে নাই।

নিজে স্বেচ্ছায় 'ধরাদিব' ভাবিয়া যেদিন ধড়াচূড়ায় সাজিয়া ধরার বুকে নাবিয়া আসিলেন, সেদিন কতগুলি হাবা

গোয়ালার ছেলে মেয়ে সে অধরচাঁদকে ধরিল। আর কতক-গুলি ভক্ত দূরে দাড়াইয়া "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" বলিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের রাজসভায় ঘোষণা করিলেন। কেহবা 'শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ' বলিয়া কৃতাঞ্জলি ভূমিষ্ঠ হইলেন, কেহবা 'ললিত লবঙ্গলতা' গাহিয়া কুঞ্জ কাননের কোকিল সাজিলেন। কিন্তু অই দুটি ; একটি ইন্দ্র-নীলমণি আর একটি সোনার খনি ; কোথায় ছিল কোথা হইতে এল, কোথায় লুকা'ল, কেহ জানিল না, জানিতে চাহিল না, জানিতে পারিল না। এক দুই করিয়া পাঁচটি হাজার বছর কাটিয়া গেল, তখন নদীয়া নগরে একটি নূতন রসের পুতুল উদয় হইলেন। নীলাচল হইতে গৌড়দেশ পর্য্যন্ত প্রেমের একটানা স্রোত বহিল। নিখিল জগতে অগণিত জীব, তন্মধ্যে অতি মুষ্টিমেয় তাহাকে চিনিল। তারা সে স্রোতস্বিনী নীরে অবগাহন করিয়া অই রাতুল চরণে জীবন যৌবন বিকাইয়া দিয়া গাহিল,—

কলিন্দ তনয়া তটে স্ফুরদমন্দ বৃন্দাবনম্
বিহায় লবণাম্বুধেঃ পুলিন পুষ্পবাটিং গতঃ।
ধৃতারুণপটঃ পরীহৃত সুপীত বাসা হরিঃ
তিরোহিত নিজচ্ছবিঃ প্রকট গৌরিমা মে গতিঃ॥

শ্রীচন্দ্রামৃত ৭৯।

যিনি যমুনা তীরবর্ত্তী সুরম্য বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া লবণ সমুদ্রতীরস্থ পুষ্পবাটিকায় গমন করিতেছেন, যিনি পীতবসন ছাড়িয়া চারু অরুণ বসন ধারণ করিয়াছেন, যিনি নীলমণি বিড়ম্বিনী কান্তি পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল গৌরকান্তি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌর হরিই আমার গতি॥

যারা অধিকারী, যারা রসিক, যারা লোলুপ, তারা জানিল, কারণ নিজে তাহাদিগকে জানাইলেন—দেখাইলেন—শেখাইলেন।

"তবে হাসি প্রভু তারে দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥"

তাহারা জানিল, এই সেই আদিতত্ত্ব। যিনি দুই হইয়া কেলী কদম্বতলে ত্রিভঙ্গিমঠামে দাড়াইয়া ব্রজবালার মনপ্রাণ চুরি করিয়াছিলেন। পণ্ডিতচূড়ামণি গৌর-প্রেমে গদগদ হইয়া গাহিয়া উঠিলেন, এবার পেয়েছি, আর কিছুই চাইনা।

ঈশং ভজন্তু পুরুষার্থ চতুষ্টয়াশা
দাসা ভবন্তু চ বিহায় হরেরুপাস্থান্।
কিঞ্চিদ্রহস্যপদ লোভিত-ধীরহন্তু
চৈতন্য চন্দ্রচরণং শরণং করোমি॥ শ্রীচন্দ্রামৃত। ৫৯॥

'ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চাই না, বলিতে কি, শ্রীকৃষ্ণের দাস্যও প্রার্থনা করিনা, কেবল একটি রহস্য আস্বাদন করিতে চাই আর তদ্বিষয়ে লোভিত-চিত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণেই

রণ লইলাম।' লীলা কৌতুকী চতুরালী করিয়া সে রহস্য কাহাকেও জানাইলেন না। স্বরূপ দামোদরের বুকে শির রক্ষা করিয়া, শ্রীরামানন্দের গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া, অষ্টাদশবর্ষ গম্ভীরায় অতি গোপনে সে রহস্যরস আস্বাদন করিলেন। আপনি ষোল আনা লুটিয়া স্বরূপ গোসাঞিঃ কি জানি কোন কারণে জীবের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া এক গোটা ময়ূরপুচ্ছ লইয়া একটি জীর্ণ তালপাতার গায়ে লিখিয়া রাখিলেন—

"একাত্মানাবপি ভুবি পুরা
দেহ ভেদং গতৌ তৌ।"

আগে ছিলেন এক, তপ্তহেমকান্তি গৌর; দ্বাপরে দূর্ব্বাদলশ্যাম আর চম্পকবরণী—এই দুই হইয়াছিলেন তিনিই। জীব ছুটিয়াছে অনন্তকাল ধরিয়া তাহাকে ধরিবে, জীবের গতি স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে, লীলা হইতে নিত্যের দিকে। লীলা-চক্র নিত্য আবর্ত্তমান. তার গতি সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের দিকে—নিত্য হইতে লীলার দিকে—সংশ্লেষণ হইতে বিশ্লেষণের দিকে। তাই আগে দেখিয়াছি "দুই" আর এতকাল বাদে পাইলাম "এক"। আজ যখন মূল পাইয়াছি, তখন আর ভুল করিবনা।

যত্তদ্বদন্তু শাস্ত্রাণি যত্তদ্ব্যাখ্যান্তু তার্কিকাঃ।
জীবনং মম চৈতন্য-পদাম্ভোজ সুধৈবতু।

শাস্ত্ররাজি যাহা বলে বলুক; তার্কিকেরা যে সিদ্ধান্ত করে করুক, কিন্তু শ্রীচৈতন্য চরণারবিন্দ সুধাই আমার জীবনের

জীবনস্বরূপ। অতি দুর্লভ অণিমাদি সিদ্ধি সকল যদি স্বয়ং আসিয়া হস্তে পতিত হয়, আর দেবতারা যদি কিঙ্কর হইবার জন্য স্বয়ং আগমন করেন অন্য আর কি বলিব, আমার এই শরীর যদি চতুর্ভুজও হয় তথাপি আমার মন শ্রীগৌরচন্দ্র হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইবেনা—শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ রেণু ব্যতীত আমি আর কিছুই কামনা করি না।

পতন্তি যদি সিদ্ধয়ঃ করতলে স্বয়ং সুদুর্লভাঃ
স্বয়ঞ্চ যদি সেবকী ভবিতু মাগতাঃ স্যুঃ সুরাঃ।
কিমন্যদিদমেব যদি চতুর্ভুজং স্যাদ্বপুঃ
তথাপি মম নো মনাক্ চলতি গৌর চন্দ্রাত্মনঃ ॥৬৪॥ শ্রীচন্দ্রামৃত।

এমনি ধারা তাহাকে ধরিল, অতি অল্প সংখ্যক। নব-যুগল শ্রীগৌর নিত্যানন্দ পদদ্বন্দ্বই যে একমাত্র ভজনীয় জানিয়া তাহাই আশ্রয় করিল পরম সৌভাগ্যবান্ জন কতক ভক্তপ্রাণ। গুপ্তরসবেত্তা শ্রীল বৃন্দাবন দাসঠাকুরের সুরে সুর মিলাইয়া অযাচিত কৃপাস্নাত হইয়া পরমাধিকারী একনিষ্ঠ ভক্তগণ গাহিলেন,—

'আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ,
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎ প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥

শ্রীনদীয়া তত্ত্বের এই সর্ব্বসার পরম সিদ্ধান্ত, যাহারা জানিলেন

তাঁহারা ডুবিয়া রহিলেন। তার আগে কোথায় কেমন ছিলেন, কেহ জানিতে পারিলেন না। তিনি কাহাকেও জানিতে দিলেন না। কেবল রসিকভক্ত শ্রীল কৃষ্ণদাস যখন লীলারস আস্বাদনে বিভোর, তখন তাহার স্বতঃ সঞ্চালিত লেখনী লিখিলেন—"চৈতন্য লীলামৃতপুর, কৃষ্ণলীলাসুকর্পূর

দুঁহুমিলি হয় সুমাধুর্য্য।

সাধু গুরু প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,

সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য॥"

এক দুই করিয়া চারি শতাব্দী কাটিয়া গেল। আবার এক ভুবন আলো-করা প্রেমের পুতুল ফরিদপুরের আঁধার কোণে আপনা ঢাকিয়া উদিত হইলেন। দুই একটি সৌভাগ্যশালী পরম অতি পরম সৌভাগ্যবান্ যাহারা, তাহারা অযাচিত করুণা রশ্মিতে উদ্ভাসিত হইয়া জানিলেন, **এই সেই, যারে চাও এই সেই**—এই সেই অনাদির আদি। শ্রীনদীয়ায় দেখিয়াছি প্রেমের মূর্ত্তি দুটি ভাই, তারাই যখন ছিলেন এক ঠাঁই, যখন শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ ছিলেন একাঙ্গ, তখনই ছিল এইরূপ, এই অপরূপ রূপ, এই ভুবন ভোলান মদনমোহন রূপরাশি। একাধারে পঞ্চতত্ত্বের অপূর্ব্ব মহামিলন প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারা গাহিলেন—

"এবার একাধারে পাঁচ ফুলের সাজি,

তুচ্ছ মরকত মণি মুকুতা রাজি।

রূপ দেখে মন ভু'লে র'ল,
বন্ধু আমার গলার হারা॥

তার আগে কি ছিল কে জানে, কোথা হইতে সেই অতুল রতন ধূলায় নাবিলেন, কেহ জানিল না, তিনি কাহাকেও জানাইলেন না। একদিন ভাবিলেন, অন্ধ জীব জগৎকে জানাইব। দু'টি বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া, আয় আয় বলিয়া ডাকিলেন; দ্বারে দ্বারে গিয়া কাঁদিলেন। বধির জীবের কাণে সে কান্না পৌছিল না। কেহ সে শান্তিদাতার চরণ তলে তত্ত্ব-সুধা লুটিতে ছুটিয়া আসিল না। তাই কাহাকে জানাইব, ভাবিতে ভাবিতে নিজেই শ্রীকর কিশলয়ে শ্রীলেখনী ধরিয়া লিখিলেন **"চন্দ্রপাত"**। একটি রস লোলুপ ভক্ত-চকোর কি জানি কোন্ সাহসে সাহসী হইয়া সেই চাঁদের তত্ত্বানুসন্ধানে এক নূতন সাজে প্রেমপুষ্প যানে এক নূতন পথে চলিয়াছেন, ঐ যে তার সাজ!

বন্ধু আমার হাতের লাঠী,
চোখের চসমা কাণের দুল,
সীঁথের সীঁথি গলার হারা,
প্রাণেশ্বর সর্ব্বমূল॥

ভক্তবর! তোমার এই নব বেশ ভূষার অগ্রে আমরা গলবাসে প্রণত হই। যে মাধুরী সুধা আস্বাদন করিতেছ,তাহার একবিন্দুই ছড়াইয়া দাও, বান্ধবকুল সহ মহামহাপ্রসাদ লুটিয়া ধন্য হই॥
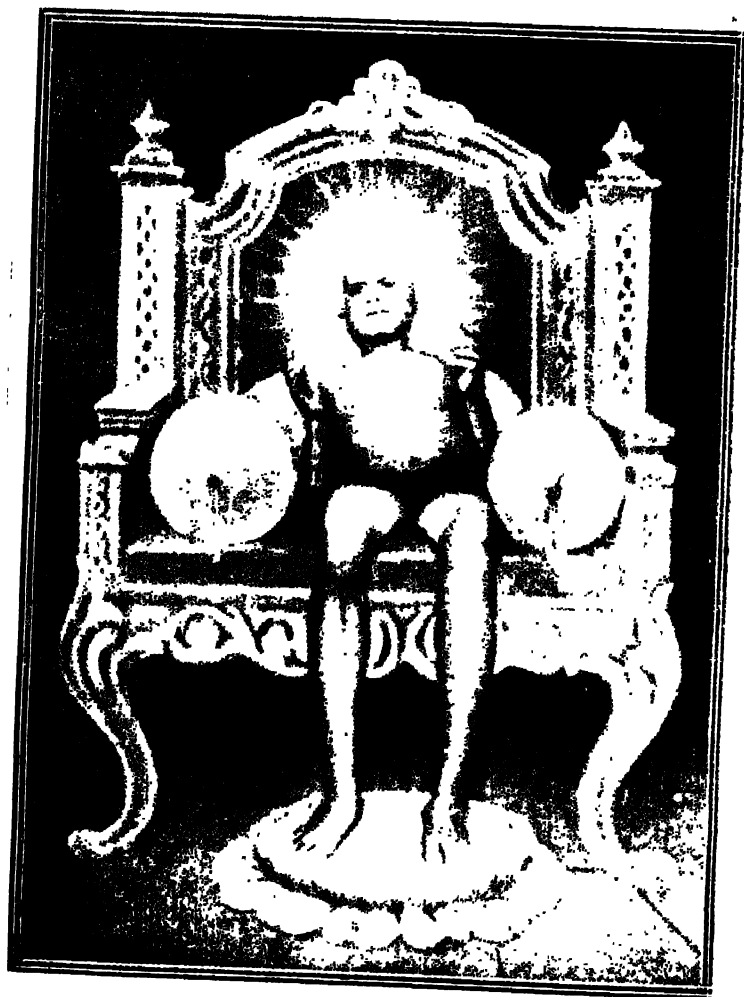
শুদ্ধ শান্ত মাধুরীমণ্ডিত পূর্ণতন্ময় চিন্ময়-বদনে
একটি শিশুমূর্তি।”

১আদি বিন্দুতে মাধুরী-ধারা ধরিয়া আরও একটু অগ্রসর হইয়া, আরও একটু নয়ন খুলিয়া ভক্তবর সন্দর্শন করিতেছেন—

১ **শুদ্ধ শান্ত মাধুরী-মণ্ডিত পূর্ণ-তন্ময় চিন্ময়-রসঘন একটি শিশু মূর্ত্তি।**

সে নিজ প্রেম জ্যোতির ঝলকে নিজেই উদ্ভাসিত। দিগ-দিগন্তে প্রসারিত সেই অপার্থিব কিরণমালায় সে নিজেই প্রকাশিত। ভাবুক ভক্ত এবার রসিক সাজিয়া তাহাকে সন্দর্শন করিতেছেন। ভক্ত দেখিতেছেন, তিনি এক নহেন, দুই। তিনি স্বপ্রকাশ নহেন, এক, দুই হইয়া একে অন্যকে প্রকাশ করিতেছেন। অনন্তানন্তময় অনন্তকাল আপনাকে আপনি প্রকাশ করিয়া স্বানুভবানন্দে ছিলেন ভাল, আজ ভক্তের হাতে ধরাপড়িতে গিয়া দুই হইয়া গেলেন। "স্ব প্রকাশিত" আজ "স্ব" আর "প্রকাশিত" এই দুই রূপে দেখা দিল। সুস্নিগ্ধ কিরণমালা বিতরণ করিয়া ষোড়শ কলায় পূর্ণতম হইয়া "স্ব" আজ স্বীয় অসীম অনন্ত মূর্ত্তিকে প্রকাশিত করিলেন। যিনি প্রকাশক, তিনি চাঁদ। যিনি প্রকাশ্য, তিনি আকাশ। যিনি প্রকাশক, তিনি প্রেমময়। যিনি প্রকাশ্য, তিনি নামময়। প্রেমের চন্দ্রমা নামকে উদ্ভাসিত করিতেছেন। নামের আকাশ প্রেমের মূর্ত্তিখানাকে বুকে লইয়া শোভা পাইতেছে, তাহাই ভক্তের লেখনীতে ফুটিয়াছে,—

"চাঁদমণি বন্ধু শ্রীহরি অম্বর"

নাম আর নামী ছিলেন এক, ছিলেন অভেদ, আজ ভক্ত তাহাকে দুই করিয়া অনুভব করিতেছেন। শ্রীশ্রীত্রিকাল গ্রন্থে শ্রীশ্রীপ্রভু স্বয়ং শ্রীহস্তে লিখিয়াছেন—

"হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু"

অর্থাৎ দুইই এক, অভিন্ন তত্ত্ব। আজ চতুর ভক্ত "হরিনাম" আর "প্রভু জগদ্বন্ধু" এই দুইটি তত্ত্বকে দুইটি পৃথক্ বস্তুরূপে পৃথক্ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আস্বাদন করিতেছেন। নাম, নামীতে আকার বিশিষ্ট। 'নামী' নামেতে সংজ্ঞিত বা পরিচিত। নামকে আলাদা করিয়া নামীকে বুঝিলে তাহার কেবল স্বরূপতঃ ভান হয়, অব্যপদেশ্য প্রত্যক্ষ হয়, কেবল রূপের ঔজ্জ্বল্যটিই জ্ঞানে ভাসে, তাই তাহাকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। নামীকে আলাদা করিয়া নামকে বুঝিলে, নাম নাম মাত্র, সীমাহীন, আকারহীন একটি অনুপলব্ধ তত্ত্ব মাত্র। তাই শ্রীশ্রীপ্রভু জানাইয়াছেন ;—

"হরি দ্বি অক্ষর নাম মাত্র।
হরিনামের কোন আকার নাই।
হরিনামের কোন অস্তিত্ব নাই।
হরিনাম চক্ষে দেখা যায় না,
হরিনাম কাহাকেও দেখান যায় না।"

ভক্ত তাই তাহাকে অম্বরের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ সে অম্বর হইতেও মহৎ "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"

সে গগন হইতেও সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মেরও সূক্ষ্ম যে কারণ, তাহারও সে সর্ব্বশেষ কারণ। তাই স্থূল সূক্ষ্ম জগতের কোন জীব বা শিব তাহাকে চক্ষে দেখে না। নামী হইতে পৃথক্ ভাবে নামকে ভাবিলে বস্তুগত্যা এইরূপই হইয়া থাকে। "হরিনাম" সে উপলব্ধিরও বিষয় নয়। তাই বলিয়াছেন, অস্তিত্ব নাই। যারা চেষ্টায় উপলব্ধির বস্তু বা সাধনায় প্রাপ্তির বস্তু, তাহাদেরই অস্ ধাতুর কর্ত্তা সাজিবার অর্থাৎ অস্তিমান্ হইবার সামর্থ্য আছে! হরিনাম তত্ত্ব "সাধ্য কভু নয়।" চির-অননুভূত চির অনুপলব্ধ, তাই কহিয়াছেন অস্তিত্ব নাই। শ্রীহরি নাম কেবল নামরূপেই জগতে ছিলেন ও আছেন। কেবল নামরূপে কেবল শব্দরূপে হরিনাম ছিলেন, আছেন। শব্দ তরঙ্গাত্মক। অনন্ত কোটি বিশ্ব প্রপঞ্চে সে তরঙ্গমালা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অপ্রাকৃত আকাশরূপী তিনি, এই প্রাকৃত আকাশে কেবল কর্ণ শস্কুল্যবচ্ছিন্ন হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত আছেন। তাই তাহাকে অম্বরের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব হইতে ক্ষুদ্র বদ্ধ জীব সবাই শুনিয়াছে "হরি" এই একটি নাম মাত্র। পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ, চারি মুখে চতুর্মুখ দিবস রজনী আকাশে সে চির অনাস্বাদিত চির অপরিজ্ঞাত শব্দটীর পবিত্র তরঙ্গমালা সৃজন করিতেছেন। সেই তরঙ্গ রঙ্গে আব্রহ্মস্তম্ব ক্রিয়াময় হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে স্পন্দিত হইতেছে। সেইস্পন্দনের এককারণত্ব অনুভব করিয়াই

বৈদিক ঋষি“একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি” এই অদ্বৈত মন্ত্র ঘোষণা করিতেছেন। সে যে শুধু নামরূপী, তাই দর্শন যোগ্য নহে, কি ভৌতিক চক্ষু, কি দিব্য চক্ষু কোনও কালে তাহা কাহারও দর্শন পথগত হয় নাই।

তাই বলিয়াছেন, হরিনাম দেখা যায় না। তারপর বলিয়াছেন “হরিনাম কাহাকেও দেখান যায় না” এই বাণীটি দ্বারাই সকল তত্ত্ব সুপরিব্যক্ত করিয়াছেন। বস্তু-দর্শন পক্ষে তৎপ্রকাশ সর্ব্বপ্রথম কারণ। আলো সত্ত্বময়, তাই প্রকাশ-স্বভাব। হরিনাম ত্রিগুণাতীত, কাজেই যত উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্মান্ আলো থাকুক না কেন, নামকে প্রকাশ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। এই প্রাকৃত জগতেও আমরা দেখিতে পাই, কম্বুগ্রীবাদিমান্ ঘটাকার-বিশিষ্ট বস্তুর অপরোক্ষানুভূতি ব্যতীত ঘট শব্দাত্মক পদের প্রকৃষ্ট অনুভব হইবার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বাতীত তত্ত্ব শ্রীহরির নাম ; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কার সামর্থ্য আছে তাহাকে প্রকাশ করিবে ? তাই বলিয়াছেন “দেখান যায় না”। আজ নামী ভাবিয়াছেন নামকে দেখাইব। কবি তাই নামীকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। স্বপ্রকাশ আজ স্বকে প্রকাশ করিয়া স্ব-রূপকে প্রকাশিত করিলেন। হরিনাম-রূপ অম্বর চাঁদরূপী নামীর প্রেমালোক ছটায় প্রভাময় হইয়া উঠিল, অতি উন্নতসত্ত্বা কৃপানুগত যারা তারা একটিবার মাত্র ঊর্দ্ধনেত্রে দেখিতে

প্রয়াস পাইল, কিছু দেখিতে পাইল না। কেবল অনুভব করিল, একটা মহান ভাব।

ক্ষুদ্র জীব যারা, তাদের বুদ্ধিবৃত্তি সসীম। তাহারা নিয়ত চাহে সুখ,অবিরাম অন্বেষণ করে শান্তি। ঋষি ভাবিল, কোথায় সুখ? 'অগ্নিমীলে' হইতে আরম্ভ করিয়া কত ছন্দোবন্ধে গান গাহিয়া ঋষি সে সুখকে খুঁজিল। কত বিভিন্ন ভাব কত বিভিন্ন চিন্তাধারা তাহাদের হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিল। কত চিন্তার কল্লোল, কত ভাবের হিল্লোল একটির পর আর একটি মাথা তুলিবার প্রয়াস পাইল। শ্রীশ্রীপ্রভু লিখিয়াছেন,—

"চারি বেদকে যুদ্ধ কহে"

বস্তুতঃ তাহাই। নিখিল বিশ্ব কার্য্যরূপে নিজেকে প্রকাশ করিতেছে, ঋষি তাহার মধ্য হইতে কারণসত্তা অন্বেষণ করিতেছে। দ্রব্যজাত কটক বলয় রূপে রহিয়াছে, ঋষি তাহার মধ্য দিয়া স্বর্ণসত্তাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহিতেছে। বস্তুর স্বভাব, সে দেশকালের অধীন হইয়া কোন একটি আকারে আকারিত ও কোনও বিশেষণে প্রকারিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ঋষি চাহিতেছেন আকার প্রকার তাড়াইয়া দিয়া মূল সত্তার সন্ধান জানিতে। প্রকৃতির আর ঋষির এই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, কার্য্য-কারণের এই ভীষণ যুদ্ধ, চারি বেদ ভরিয়া দেখিতে পাই, অকস্মাৎ এক শুভক্ষণে দূর অতি দূর হইতে সে মধুর সন্ধান পাইয়া ঋষি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া গাহিয়া উঠিল,—

'মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'

দশদিকে পিযূষধারা দেখিয়া ঋষিগণ পাগলপারা ইতিউতি চাহিলেন। কার এত মধু, কোথায় এ মধুর উৎস—কোথা হইতে এ মধু ধারা ক্ষরণ হইতেছে! স্থির দৃষ্টিতে ঋষি দেখিলেন একটা বিরাটের ছায়া। অমনি প্রীতি উৎফুল্ল হৃদয়ে কহিয়া উঠিলেন ;—

'ভূমা ! ভূমা !! ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।'

যাহা অসীম ; যাহা অনন্ত, তাহাই নিত্য, তাহাই শুদ্ধ, তাহাই পরম শান্তির আলয়। যাহা সৎ, যাহা অসৎ যাহা সদসতের আদি যখন সৎ ছিলনা, অসৎ ছিলনা, তখন যাহা ছিল। যখন কিছু রহিবে না, তখন যাহা রহিবে তাহাই ভূমা। অসংখ্য ঋক্ আবৃত্তি করিতে করিতে সামঝঙ্কারে গগন পবন দোলাইয়া ঋষিরা সে ভূমা সন্নিকট হইতে চাহিলেন। তাঁহাদের সে প্রচেষ্টার নিদর্শন উপনিষদ। তাঁহারা উপ অর্থাৎ সমীপে নিষণ্ণ হইতে চাহিলেন। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, এক কথায় 'তজ্জলান্' গাহিয়া তাহারা ছুটিলেন। সে সুদূর অতীত যুগের কথা। আজও শত সহস্র বিজিজ্ঞাসু সেই এক সন্ধানে ছুটিতেছে, অনন্ত যুগ ধরিয়া ছুটিবে, কিন্তু জানিবে না—কৈ এযাবত কেহ জানে নাই। সে ভূমাস্বরূপ কেহ কোনও কালে দেখে নাই। জীবের এই প্রচেষ্টার উৎসাহময়

বেদ বেদান্ত গাথা, আর অকৃতকার্য্যতার শূন্যবাদ ও নাস্তিক বাদের দুঃখময় কথা সব তার কাণে পৌছিল। অনন্ত আলোড়নে সে হৃদয় আলোড়িত হইল। অনন্ত জীব জিজ্ঞাসু, সে ভূমা-পুরুষ আড়ালে রহিয়া জলদমন্দ্রে ঘোষণা করিলেন,—

"বিষয় আর কিছুই নহে দুটি অক্ষর মাত্র
'হ' আর 'রি' ॥"

ভক্তগণ! আসুন বেদের যুদ্ধকাণ্ড, ব্রাহ্মণের কর্ম্মকাণ্ড বেদান্তের জ্ঞানকাণ্ড আর পতঞ্জলির যোগকাণ্ড হইতে এবার আমরা একটু বাহিরে গিয়া, নির্ম্মল অম্বর জলে হাপ ছাড়িয়া, অক্ষৌহিণী কণ্ঠে অতি উচ্চৈঃস্বরে বলি "দুটি অক্ষর মাত্র 'হ' আর 'রি'। প্রাণ খুলিয়া হৃদয় ভরিয়া আবার বলি "হরি বোল" শুদ্ধ নামময় ঐ শব্দটি। এই সেই ভূমা, এই সেই মহান, পরম মহান্, নির্ব্বিশেষ মহান্। ভক্ত তাহাই কহিতেছেন ;—

"শ্রীহরি অম্বর"

সাংখ্যাচার্য্যের প্রকৃতির বিকারভূত অম্বর নহে। অসংখ্য পুরুষপ্রকৃতির যাহা একমাত্র আশ্রয়ভূত, এই সেই অম্বর। বৈদান্তিকের ব্যবহারিক-নিত্য অম্বর নহে। অনন্ত পারমার্থিক যে নিত্যতা, তাহারই নিদানভূত যে অম্বর তাহাই হরি। আজ আপনার অসীম স্বরূপ প্রকাশ করিতে পরম শান্তোজ্জ্বল হরি-পুরুষ রূপে প্রকট হইলেন। অন্ধকারে বস্তুজ্ঞান হইলে

ভ্রমবুদ্ধির আশঙ্কা থাকে। জীব জগতের পরম সৌভাগ্য ফলে প্রকাশকের সহিত প্রকাশ্যের প্রকাশ হইয়াছে। হরি পুরুষের সঙ্গে হরি নামের উদয় হইয়াছে। নামের সঙ্গে নামী মিশিয়া মহাউদ্ধারণ চন্দ্র প্রভু জগদ্বন্ধু রূপে প্রকাশমান হইয়াছেন।

অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদের ইহাই ধারণাতীত নিগূঢ় রহস্য।

স্থূলকথা—নাম আর নামী—দুইটি অভেদ। ভক্ত তাহাকে ভেদ করিয়া আস্বাদন করিতেছেন। একটি মণি, আর একটি তার আভা। একটু ভেদ আছে বটে, কিন্তু পৃথক্ করিতে পারিবে কি? আভাতেই আলো হয়, মণিতে হয় না। কিন্তু আভা সে মণিকে ছাড়িয়া কস্মিন্‌কালেও থাকিবে কি? মণির আভাতেই মণি দেখা যাইতেছে, আভার মধ্যস্থলেই মণি আপনাকে প্রকাশ করিয়া আছে। আবার মণিই অফুরন্ত আভাকে বিস্তার করতঃ আপনার সত্তা পৃথক্‌ভাবে দেখাইতেছে। আভা নির্ব্বিশেষ, তাহা মণিগত হইয়া আভাযুক্ত মণিকে সবিশেষ করিয়াছে। ইহাই ভেদাভেদ। ভক্তবর "চাঁদমণি বন্ধু শ্রীহরি অম্বর" লিখিয়া এই ভেদাভেদ তত্ত্বেরই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতেছেন।

নিত্যলোকে অপ্রকটলীলা আর শ্রীধামে প্রকটলীলা—শ্রীহরির লীলার এই দুইটি অবস্থা বা প্রকার। নিত্যে ভেদ—মণি আর তার ঔজ্জ্বল্য। 'চাঁদমণি বন্ধু' আর 'শ্রীহরি অম্বর'। 'হরিনাম' আর 'প্রভু জগদ্বন্ধু' ভেদবিশিষ্ট দুইটি তত্ত্ব। এক

প্রকাশ্য, আর এক প্রকাশক। চাঁদ না থাকিলে অম্বর প্রকাশ হইবে না, আর অম্বর না থাকিলে কে চাঁদকে বুকে ধরিয়া দেখাইবে? আর এবার প্রকট লীলায় ধাম শ্রীফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে অভেদ; দুই এক—হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু, একই তত্ত্ব। সপ্তদশবর্ষ আঁধার ঘরে শুধু ঔজ্জ্বল্য রাশিই দেখিয়াছি। আজ শ্রীচন্দন সম্পূটে শুধু মণিটিকেই পাইতেছি। অথবা নাম নামীর পূর্ণতম মিলনে পূর্ণ পূর্ণতম একটি অপূর্ব্ববস্তু অনুভব করিতেছি। নাম, নামরূপে নির্ব্বিশেষ, তাহারই আভাস পাইয়া শ্রুতি নির্ব্বিশেষ বাদ প্রচার করিয়াছেন। নামী সবিশেষ, তাহারই সন্ধান পাইয়া সেই শ্রুতিই তাঁহাকে সবিশেষ গাহিয়াছেন। আজ শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গনে লীলায় সবিশেষ নির্ব্বিশেষ মহামিলনে একটি অভূতপূর্ব্ব সত্তা দেখিয়া ভক্তের সকল সংশয় মিটিয়া গিয়াছে। বিপরীতধর্ম্মী দুইএর মিলন চিন্তার অতীত, তাই অচিন্ত্য। সেই অচিন্ত্য ভেদাভেদ আজ চিন্তার গোচরী-ভূত হইতে প্রকটী ভূত হইয়াছেন। যুগ যুগান্ত ধরিয়া দার্শনিক দলের যাহা দ্বন্দ্বের বিষয়, তাহা আজ মিটিয়া গিয়াছে। আসুন, সকলে সমকণ্ঠে বলি, আমার হরিনাম অম্বর নির্ব্বিশেষ; আমার নামী চাঁদমণি সে সবিশেষ, দুইএর মিলনে "প্রভু জগদ্বন্ধু" অচিন্ত্য তত্ত্ব। আমার হরিনামের আকার নাই; অস্তিত্ব নাই তাই নিরাকার অবাঙ্‌মনসোগোচর, শ্রুতির 'অপাণিপাদ' 'অচক্ষু' 'অকর্ণ'; আমার চাঁদমণি বন্ধু নিত্য

সত্য অস্তিমান্ শ্রুতির 'জবন' বেগশালী, 'পশ্যতি' 'শৃণোতি, সব দেখেন ; সব শোনেন। 'যতো বা জায়ন্তে, যেন জীবন্তি যৎপ্রযান্তি' এই অপাদানাদি কারকত্রয়ের সেই আনন্দময়ই আশ্রয়। তিনি সাকার ; দেখেন, শোনেন, চলেন।

তাঁহার হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, কিন্তু সব অপ্রাকৃত, প্রকৃতির বিকারভূত নহে। তিনি প্রকৃতির স্বামী, প্রকৃতির নিয়ন্তা, তাই তদধীন নহেন, এই সেই চাঁদের তত্ত্ব।

আজ নাম নামীর অপূর্ব্ব সম্মিলন ; সাকার নিরাকারের অপূর্ব্ব সমাবেশ। অচিন্ত্য অনর্ব্বচনীয় নাম, নামীর সঙ্গে মিলিয়া একীভূত হইয়া প্রকট হইয়াছেন। তাই **"হরিপুরুষের প্রকাশ নাম প্রভু জগদ্বন্ধু"**—ইহাই চন্দ্রপাত মাধুর্য্য। সে মাধুরীর বিন্দুর বিন্দু, যাহা শ্রীগুরুদেবের কৃপাবলে অনুভব করিয়াছি, তাহাই সিন্ধুস্বরূপ। তত্ত্বপিপাসু বান্ধবগণ অবগাহনে শীতল হইলেই ধন্য হইব।

তবে দার্শনিক পণ্ডিত মহাশয়দের কটাক্ষ হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। তাহারা বলিবেন, এমন একটি মধুময় হরিনামরূপ আকাশ ছিল, আর তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া নামীরূপ চাঁদ শোভা পাইত, এই অদ্বয়তত্ত্ব বস্তুটি কিনা অমন দিব্য জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত মহা মহা ঋষিগণের চক্ষে পড়িল না। তাঁহারা এত কথা বলিলেন, এত বেদ পুরাণ রচনা করিলেন, আর হরিনামের কথাটি স্পষ্টতঃ বলিতে পারিলেন না।

এতকাল বাদে কিনা নবদ্বীপ প্রবাসী বৈদিক বুধ ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের এক উদ্ভট জাতনাশা ছেলে সেই নামের তত্ত্ব জগতে প্রকাশ করিল। পরিশেষে আজ এতকাল পরে, ফরিদপুরের এক কোণে সেই নামস্বরূপ স্বয়ং প্রকট হইয়া নিজেই নিজের পরমাতিপরম মাধুর্য্য সর্ব্বতত্ত্বাতীত রসনির্য্যাস সম্পুট খুলিয়া আস্বাদন করিতেছেন। আর জন কতক ভক্ত তাহা জানিয়া শুনিয়া প্রচারক সাজিয়াছে। ইহা কি অদ্ভূত কথা নয়? বটে, কথাটা অদ্ভূত বটে, কিন্তু ভাই দর্শনবিদ্ অভূতপূর্ব্ব হইলেই কি তোমার সংশয় হইবে? অভূতপূর্ব্বত্ব কি কখনও সংশয়ের পক্ষে কারণ হইয়া থাকে। সাধারণ মানুষের সম্বন্ধে তাহা হইতে পারে কিন্তু কুশধগ্রৈকধী তর্ককুশল দর্শনজ্ঞের সম্বন্ধে তাহা নহে। সংশয় বিমর্শাত্মক। অভিনবত্বই কি তোমার বিমর্শের জনক। দিনের পর দিন মুহুর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত তুমি কি নূতন নূতন তথ্য জানিতেছ না? যদি না জান, তবে দার্শনিক-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া এস, শুন, ভক্ত তোমার বিমর্শ কিরূপে নিরাকরণ করিতেছেন।

"সুমাধুর্য্য সুভগ চুষী কাদম্বিনী"

আগে অর্থের অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া পরে তত্ত্বের ঝঙ্কার শ্রবণ করিব। একখানি স্বচ্ছ সুনির্ম্মল আকাশে একটি ষোল-কলায় পূর্ণতম নিস্কলঙ্ক চাঁদ বড় শোভায় শোভিত হইয়া ছিল অনন্ত যুগাতীত যুগ হইতে ছিল—আছে—থাকিবে। চক্ষুষ্মান

মাত্রই উন্মুখ হইলে তাহাকে দেখিতে পাইত। উলুকের মত চোখ বুজিয়া থাকিলেও সে পুত রশ্মিমালা চক্ষু খুলিয়া নিজেকে দেখাইয়া দিত।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অগণিত অধিবাসী তাহাই চাহিয়াছিল। যদি দেখিতে পাইত, যদি একটিবার সে অপ্রাকৃত চাঁদের আলোক-কণা তাহাদের গায়ে লাগিত, তবে সকলের সকল সাধ একদিনে মিটিয়া যাইত। কোটী কোটী শাস্ত্রপুরাণ বেদ বেদাঙ্গ দর্শন, উপনিষদ, কোরাণ, বাইবেল রচিত হইত না, সকলেই পরাশান্তি লাভ করিয়া চিরতরে পরিতৃপ্ত হইত। কাহারও কোনও বাসনা থাকিত না। সর্ব্ব বাসনার উচ্ছেদ হেতু সৃষ্টিপ্রবাহ সংরুদ্ধ হইয়া পড়িত। বুঝিবা আকাশের সঙ্গে চাঁদেরও সেইরূপ পরামর্শই ছিল, কিন্তু তেমনটি হইল না: হঠাৎ একখানি নীল রংএর কাদম্বিনী আকাশখানাকে আবৃত করিয়া নাচিয়া উঠিল। আমরা কেবল সেই মেঘমালা দেখিলাম আর বৃষ্টিধারায় ভিজিলাম। এক দুই করিয়া তিন পশ্‌লা বাদলধারা ধরণীকে শান্ত শীতল স্নিগ্ধ করিয়া আকাশখানাকে একটু পাতলা করিয়া দিয়াছে। তাই অনন্তকে লইয়া শান্ত, আকাশকে লইয়া চাঁদ চক্ষের উপর ভাসিতেছে, 'হঠাৎ' শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছি কথাচ্ছলে, ভাবটাকে প্রকাশ করিবার জন্য। সত্য বলিতে কি! ঐ আকাশে ঐ চাঁদের প্রকাশ যতকাল আছে, ঐ কাদম্বিনীর

আবরণও ততকাল আছে, আর অমৃতময় বারিবর্ষণও ততকাল আছে, ধরণীর অণু পরমাণুও ততকাল সিক্ত হইতেছে—ঐ চাঁদের ধূলায় পতনও ততকাল আছে, আর এই অমৃতচ্ছন্দ চন্দ্রপাত ততকালই বসুন্ধরার তাপদগ্ধ বুকখানি শীতল করিতেছে। ইহাই অচিন্তনীয় ব্যাপার। ভক্ত তাই নিত্যকে উৎপত্তিধর্ম্মিক ধরিয়া একটি দৃশ্যের পর আর একটি দৃশ্য দর্শন করিয়া আস্বাদন করিতেছেন—আমরাও তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিব। এইবার মেঘের আবরণটা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

এই সংসারের যে কোন বস্তু সম্বন্ধেই দেখিতে পাই—অসংখ্য বৃত্তিময় মানবচিত্তে কোন কিছুরই স্বরূপতঃ ভান হয় না। কোনও পরিচ্ছিন্ন দেশ ও কালাবচ্ছেদে কোনও ক্রিয়ার কর্ত্রাদিষটকের অন্যতম আশ্রয়রূপে প্রত্যেক বস্তুই কর্ম্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় হইয়া বিরাজ করে। আপনি শ্রীঅঙ্গনে প্রবেশ করিয়াই শ্রীমন্দির সম্মুখে একটি চালিতা বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। আপনি ঐ নিত্যধামে অত যত্নে রক্ষিত তরুটিকে চিনিতে পারিলেন কি? নিশ্চয়ই পারেন নাই, কারণ পারিবেন কি করিয়া? স্থান শ্রীঅঙ্গন; কাল এই মধ্যাহ্ন; এই দুইএর আশ্রয়ে, পাদমূলে উপবিষ্ট কীর্ত্তনশ্রান্ত মহাপ্রসাদ লোলুপ ভক্তকুলের ছায়াপাদপরূপে আপনি তাহাকে দর্শন করিতেছেন। স্নিগ্ধ শ্যামল পত্ররাজি পরিশোভিত অগণিত

ফলভারাবনত একটি শোভন তরুরূপে আপনি তাহাকে দর্শন করিতেছেন। এর বেশী আপনি কিছু জানিতে পারিতেছেন কি? আর একটি ভক্ত সেদিন তাহাকে দর্শন করিয়া গাহিল—

"যোগমায়ার বর কন্যা, বৃক্ষরূপে শত ধন্যা,
রূপসী চালিতা বন্ধু প্রেয়সী পরা॥"

কই? আপনি আমিতো সেরূপ বলিতে পারিলাম না। এইরূপ হইবার কারণ কি? তাহাই বলিতেছিলাম, প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপই আবরণে আবৃত থাকে, সাধারণ মানুষ সেই আবরণ রাশিই দেখে, তাহা ঠেলিয়া ফেলিয়া স্বরূপ দর্শন করিতে পারে না। এইসব বাহিরের জগতের কথা বটে, কিন্তু মজার কথা এই যে, অন্তর জগতে—অন্তরের অন্তরতম নিত্য সত্য জগতেও ঐরূপ একটা আবরণের খেলা আছে। তবে সে আবরণটা একটু অভিনব ধরণের।

চাঁদমণি বন্ধু আছেন স্বপ্রকাশ। কিন্তু আমাদের এতদ্দেশীয় চাঁদসূর্য্যি বা মণি মাণিক্যের মত অণুচেতন-কিরণ-বিকীরণী জড়বৎ স্বপ্রকাশ নহে; পূর্ণ চৈতন্যবান্। পূর্ণ-চেতনাবান অর্থে বুঝি পূর্ণ সত্তাবান কোন বস্তু সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞানবান্। কিন্তু তিনি ছাড়া কোন পূর্ণ সত্তাবান্ নিত্য বস্তু তো আর দ্বিতীয় নাই, তবে তিনি কি জানিয়া পূর্ণ চৈতন্যবান্ হইবেন? ইহা অতীব রহস্যময়। এই রহস্য ভেদ করিতেই সুরসিক ভক্ত চুষীর অবতারণা করিয়াছেন। আমাদের

শ্রীশ্রী চালিতা রাণী ।

'যোগমায়ার বরকন্যা, বৃক্ষরূপে শত দল
কপর্দী চালিতা বক্ষ-প্রেয়সী পরা ।'

জ্ঞানবীরগণ তাঁহাকে পূর্ণ চৈতন্যবান্ না বলিয়া পূর্ণ চৈতন্যময় বলিয়াই কার্য্যশেষ করিয়াছেন। আমরা অত জ্ঞানী নহি; একটু ভক্তিরস পিপাসু। তাই আমরা আমাদের ভগবানকেও ভাবি—পিপাসু। আমাদের চাঁদমণি বন্ধু চুষী-রস-পিপাসু। এবার এই চুষীকে বুঝিতে হইবে। তারপর তাহার সু-মাধুর্য্যত্ব ও সুভগত্ব জানিতে হইবে, তারপর কি করিয়া সেই চুষী কাদম্বিনী হইয়া চাঁদকে আবরণ করিল তাহা আস্বাদন করিতে হইবে। তথাহি চুষী পরিচয়ঃ—

"এ চুষী নয় কাঠের নোলা,
কিম্বা তপ্তরুক্মের ঢেলা গোলা;
প্রেমপীযূষবর্ষিণী ক্ষীরাম্বুধি
রস-পুত্তলিকা কমলা।

অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ সতী,
মহারাধা ভাবমতী,
গরবে ও অধর চুমি'
হাসে খেলে লীলাবতী।

শিশুবালার আতর গোলাপ,
নির্ম্মলা গঙ্গাজল সই;
একান্নরাগ প্রসবিনী
রূপান্তরে করতাল মৃদঙ্গ তাথৈ॥"

অন্বয়ার্থ :—

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, প্রাকৃত জগতের এই তিনটি স্তর। এই চুষী কোন্ স্তরের কোন উপাদানে গঠিত, তাহাই জানাইতেছেন—'**কাঠের নহে**' বলিয়া স্থূল জাগতিক দ্রব্যত্ব ও তপ্তরুক্ম নহে বলিয়া সূক্ষ্ম ও কারণ জাগতিকত্ব নিবারণ করিতেছেন। ক্রমে উপমা সমাধান করিতেছি। এই স্থূল জগতের বস্তুজাত ক্ষণস্থায়ী। সূক্ষ্ম ও কারণ জগৎ হইতে আলাদা করিয়া বুঝিলে স্থূল ভুল, স্থূল সারশূন্য অগ্নি পরীক্ষার কিছুই অবশেষ থাকে না। তাই কাঠের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কাঠ পোড়াইলে ছাইমাত্র অবশেষ থাকে। স্থূল দেহ, ইন্দ্রিয়, ঘট পটাদির সার কিছুই পাইনা—তথাহি—

তোরা প্রাকৃতভাবের সিদ্ধি ঘু'টে যতই কেননা খা'স।
মহাউদ্ধারণের কৃপা বিনে সে সব যে পাঁশ সে পাঁশ॥

অতএব কাঠের নহে বলিয়া চুষীর উপাদান স্থূল জগতের কোন বস্তু নহে ইহাই বিজ্ঞাপন করিতেছেন।

"**তপ্তরুক্মের ঢেলা গোলা**"। গোলা—গোলাকার। ঢেলা—কঠিন বস্তু। অবজ্ঞা জ্ঞাপনোদ্দেশে ঢেলা পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। রুক্ম—সুবর্ণ। তপ্ত পদটি ঢেলার বিশেষণ, রুক্মের নহে। অতএব অর্থ দাঁড়াইল—উত্তপ্ত গোলাকার-বিশিষ্ট স্বর্ণখণ্ড (a hot circular piece of gold) ইহা দ্বারা সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের স্বরূপ প্রকাশ করিলেন।

গোলাকার কোন সুবর্ণখণ্ডকে উত্তপ্ত করিলে কি পরিণাম হয়? প্রথমতঃ গলিয়া যাওয়ায় তাহার গোল আকারতার উচ্ছেদ হয় বটে, কিন্তু যতই তাপ দেওনা কেন, সুবর্ণত্ব ও উজ্জ্বলত্বের কদাপি উচ্ছেদ হয় না। কাঠের মত সে কেবল ছাইতে পরিণত হয় না। গোলরূপ বাহ্যিক আকারটি নষ্ট হয়। কিন্তু ঔজ্জ্বল্যরূপ প্রকার ও স্বর্ণরূপ সত্তা ধ্বংস হয় না। জাগতিক সকল বস্তুর মধ্যে একমাত্র সুবর্ণের এই বিশেষত্ব; তাই উপমার্থে সুবর্ণকে গ্রহণ করিয়াছেন। সকল পার্থিব বস্তুই অগ্নির পাকে রূপ (colour) পরিত্যাগ করে; কোন কোন বস্তু বা একেবারে স্ব-স্বরূপও হারাইয়া ফেলে। পাকের দ্বারা মৃত্তিকার ঘটের রূপ পরিবর্ত্তন হয়। কাঠের ঘটের স্বরূপ ধ্বংস হয়। কিন্তু গোলাকার সুবর্ণখণ্ডের কেবল মাত্র গোলাকারটি নষ্ট হয়। যত অগ্নিতাপ লাগাইবে, ততই উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইবে, সুবর্ণ নির্দ্দোষ হইবে, কিন্তু কদাচ স্বরূপ হারাইবে না। সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের স্বভাবও ঠিক এরই অনুরূপ। একটু সমাহিত-চিত্তে চিন্তা করিলেই বোঝা যাইবে। কারণ পর্য্যন্তও আকার আছে, তাহা প্রাকৃত। মহাপ্রলয়ে তাহাও থাকিবে না। কেবল মাত্র একটি কণা চিৎস্বরূপ তাহাই থাকিবে।

চুণী সে চিৎকণা মাত্র নহে। আরও অধিক কিছু। চুণী চিন্ময়—চুণীতে প্রাকৃতত্বের লেশ মাত্রও নাই। 'কাঠের নোলা

কিংবা তপ্ত-রূক্সের ঢেলা গোলা নহে' বলিয়া সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতত্ব নিষেধ করিতেছেন, ইহার প্রত্যেকটি পদই সার্থক। এতৎসম্বন্ধে প্রমাণ, যথা, শ্রীত্রিকালে—"**ত্রিকাল হইতে তিন হস্ত দূরে উদ্ধারণ। উদ্ধারণ হইতে একবিংশ হস্ত দূরে হরি পুরুষ**"। যে পর্য্যন্ত কালের ত্রৈবিধ্য বোধ আছে, সেই পর্য্যন্ত কালের অধীন। যাহা কালের অধীন, তাহা প্রাকৃত—অতএব ত্রিকাল পদদ্বারা প্রাকৃতজগৎ বুঝাইতেছেন। হরিপুরুষ তাহা হইতে বহুতর উর্দ্ধে অবস্থিত। চুষী হরিপুরুষের আস্বাদনের বস্তু, অতএব অপ্রাকৃত।

কিরূপে বুঝিতে পারিলেন যে চুষী প্রাকৃত নহে, তাহাই বলিতেছেন ;—"**প্রেম-পীযূষ-বর্ষিণী**"। এই প্রাকৃতরাজ্যে এমন কোন বস্তু নাই যাহা অবিরত প্রেমামৃত ধারা বর্ষণ করিতে পারে। তথাহি—

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্থ সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কোবা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥

প্রাকৃত প্রত্যেক বস্তুতেই আত্ম-পরিতৃপ্তি বাসনা নিহিত আছে। ঐ বাসনার গন্ধ মাত্র থাকিতে প্রেমোদয়ের সম্ভাবনা নাই। যেখানে প্রেম উদয়ের সম্ভাবনা নাই, সেখানে প্রেমদাতৃত্ব সম্বন্ধে কা কথা ? এ চুষী ছিটাফোটা প্রেমদাতা নহে, অবিরাম প্রেমধারা সিঞ্চনই চুষীর ধর্ম্ম। অতএব প্রাকৃতত্ব নিরাকৃত হইল।

ক্ষীরাম্বুধি। ঘস্ ধাতু হইতে কর্ম্মবাচ্যে ক্ষীর শব্দ নিষ্পন্ন। ক্ষীর শব্দে আহার্য্য। অম্বুধিপদ বহুত্ব বিজ্ঞাপক। সর্ব্বপ্রকার আহারীয় সমষ্টি। শ্রীহরি পুরুষ সর্ব্ব ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা যাহা আহরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তৎসমষ্টি স্বরূপা চুষী। "অপাণি পাদ" শ্রুতি স্মরণ করিয়া শ্রীহরির "ইন্দ্রিয়" শব্দটী শ্রুতিবিরুদ্ধ মনে করিবেন না। অপাণি শ্রুতির 'অ'-কার পাণি প্রভৃতির সংযোগ-সম্বন্ধ নিষেধ করিয়াছে, সমবায় সম্বন্ধ নহে। নিত্য সমবায় সম্বন্ধে নিত্য-পাণিপাদ তাহাতে নিত্যকালই আছে।

"রস পুত্তলিকা" পুত্তলী শব্দ আকার জ্ঞাপক। কণ্ প্রত্যয় আদরাতিশয্যে। অনন্ত রস ঘনীভূত হইয়া আস্বাদন-যোগ্য আকার বিশিষ্ট।

"কমলা" কমল সদৃশ কর। 'অর্শ আদিভ্যোঽচ্' প্রত্যয় * স্বীকার করিয়া সেই পদ্মসদৃশ করে স্থিত বুঝাইতেছে। সর্ব্বত্র স্ত্রীলিঙ্গ নির্দ্দেশ রহস্য বলিতেছি। যিনি আস্বাদক, অনন্ত বিশ্বে যিনি একমাত্র আস্বাদন কর্ত্তা—তিনি পুরুষ। যাহা আস্বাদনীয় তাহা প্রকৃতি। এই তত্ত্ব পরে আলোচনা করিব। চুষী, তদ্বিশেষণ, তৎপরিণাম, সর্ব্বত্র স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগ দ্বারা ঐ তত্ত্বটির ইঙ্গিত করিয়াছেন।

"অঙ্গুষ্ঠ" অঙ্গু অর্থ হস্ত। তাহাতে প্রধান রূপে স্থিত।

---

* অষ্টাধ্যায়ী ৫।২।১২৭

"**পরিমাণ**"—পরি সম্যকরূপে মান বা মাপ হয় যাহা দ্বারা। লৌকিক দ্রব্যাদির ওজন করণার্থ ব্যবহৃত প্রস্তর খণ্ডকে পরিমাণ কহে। শ্রীহরিপুরুষের অন্তর্নিহিত অনন্ত রস সমুদ্রের পরিমাণ হইতেছে যাহা দ্বারা। যদিচ অনন্তের পরিমাণ সম্ভব নহে তথাপি এক দেশ নির্দ্দেশ দ্বারা উদ্দেশ সম্ভব। শ্রীহরিপুরুষ অনন্ত-রস-সমুদ্র স্বরূপ। চুষী তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে।

"যত্র পূর্ণং বস্তু দর্শয়িতুং ন শক্যতে
তত্রৈক দেশ নির্দ্দেশে নৈব উদ্দিশ্যতে
অঙ্গুল্যগ্রে সমুদ্রোহয় মিতি বৎ" ইতি শ্রীজীবঃ।

ঐ চুষী যদি শ্রীকরকমলে না রহিত তাহা হইলে কি করিয়া জগজ্জীব সে অনন্তরস মাধুর্য্য জানিতে পারিত? 'তাই চুষী রসের নির্দ্দেশক। অতএব কহিয়াছেন 'পরিমাণ'।

'**সতী**'—নিত্যকাল ঐ মধুর অধরে সংলগ্নত্ব নিবন্ধন 'সতী' কহিয়াছেন। মুহূর্ত্তরেও শ্রীহরি পুরুষের সঙ্গে ঐ চুষীর বিচ্ছেদ নাই, কারণ ঐ রসধারায় বিরাম হইলে যে মুহূর্ত্তে অনন্ত বিশ্বের অনন্ত ভগবান ভগবতীর লীলারস শুষ্ক ও মরুময় হইয়া পড়িবে। তাই কহিয়াছেন, সতী।

"**মহারাধা**"—চুষী শ্রীহরিপুরুষের মহাভাব স্বরূপিনী। ব্রজ ও গৌর লীলার সমগ্র রসসমষ্টি। সেইজন্য মহারাধা কহিয়াছেন। ক্রমে এই পদের মাধুরী ব্যক্ত হইবে।

"**ভাবমতী**"—এই শব্দ দ্বারা চুষীর সম্পূর্ণ স্বরূপ পরিব্যক্ত করিতেছেন। অনন্তরসমাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীশ্রীহরিপুরুষ। তিনি সাধ করিলেন, নিজ মাধুরীকে পৃথক্ করিয়া উপভোগ করিবেন। ইহা আত্মারামের রমণ। তিনি দুই ভাগ হইলেন। আপনার অসীম ভাবরাশি নিজ হইতে পৃথক্ করিলেন। তাহাই চুষী। তাহাই অনাদি কাল ধরিয়া চুষিতেছেন। তাহাই কহিয়াছেন চুষী 'ভাবমতী'।

"**গরবে ও অধর চুমি**" এই পদদ্বারা কবি চুষীর আর একটি অতি অভিনব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীশ্রীহরি-পুরুষ শিশুবন্ধুই যে কেবল চুষীকে আস্বাদন করিতেছেন তাহা নহে, চুষীও তাঁহাকে আস্বাদন করিতেছেন। জ্ঞাতা জ্ঞেয়কে জানিতেছে আবার জ্ঞেয় ও জ্ঞাতাকে জানিতেছে—সবই অভূতপূর্ব্ব ও চিত্ত-চমৎকারী।

"**হাসে খেলে লীলাবতী**"—এই চুষীর আস্বাদনই পরম শিশুর স্বীয় অন্তর্নিহিত রস সিন্ধুমাঝে আপনা নিমজ্জন। তাহা হইতেই অনন্ত লীলার সৃষ্টি। ক্রমে তাহা আস্বাদন করিব। এই চুষীর আস্বাদনই সর্ব্ব লীলার প্রসূতি—তাই কহিয়াছেন 'লীলাবতী'।

"**শিশুবালার আতর গোলাপ**"—শিশুবালা পদদ্বারা পরম শিশুবন্ধুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দ রস-পিয়াসী ভক্তকুলকে উদ্দেশ করিতেছেন। ভক্ত তাহার প্রিয়তমের সেবার জন্য

যত সুন্দর শোভনীয় সৌরভযুক্ত বস্তু আছে ; তাহাই সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু পরম শিশুবন্ধুর সেবাভিলাষী বান্ধবগণের আর কোনও সম্বল নাই। অই চুষীটি প্রাণবঁধুর হাতে তুলিয়া দেওয়া মাত্র। তাহাদের প্রাণধন ঐ চুষী চুষিয়া খুসী হয়েন। তাহা দেখিয়াই তাহারা পরিতৃপ্ত। তাই সুগন্ধি পুষ্প, শ্রীতুলসীপত্র, ফলজল, পূজোপকরণ যা' কিছু শিশুবালার আদরের—সে সবই ঐ এক চুষীতে পর্য্যবসান।

"নির্ম্মলা গঙ্গাজল"—বিশুদ্ধ প্রেম। শ্রীশ্রীবন্ধু সেবা পরায়ণ ভক্তের বিশুদ্ধ প্রেমের বিষয়—এই একমাত্র চুষী। জীবনমন পণ করিয়া তাহারা প্রতিনিয়ত ঐ চুষীকেই ভালবাসে। কারণ চুষী তাহাদের প্রিয়তমের প্রিয়তম বস্তু।

"সই"—সখী—সঙ্গিনী। শ্রীবন্ধু প্রেমরস নিমগ্ন হইয়া ভক্ত যখন সেবাভিলাষে তাহার প্রাণবন্ধুর সম্মুখীন হয় তখন এই জগতের কোন বস্তুটাকে সে স্বীয় সঙ্গী করিয়া লয়? কাহাকে সঙ্গে দেখিলে তাহার প্রাণধন সুখী হয়েন? কাহাকে সঙ্গী করিয়া লইলে প্রাণনাথের প্রকৃষ্ট সেবা হয়? সে ঐ চুষী। তাই চুষীকে সই বলিয়াছেন।

"একান্ন রাগ প্রসবিনী
রূপান্তরে করতাল মৃদঙ্গ তাথৈ ॥"

অমিয় চুষীর পরিচয় দাতা এতক্ষণে মনের কথা খুলিয়া কহিতেছেন। চুষী মহাউদ্ধারণ রসস্বরূপ—নিত্যলোকে

নিত্যকাল শিশুবন্ধুর আস্বাদন-সামগ্রী। একথা বেশ। কিন্তু এবার প্রকট লীলায় সে চুষীটি কোথায় গেল? যে চুষী ভক্তগণের একমাত্র সম্বল, একমাত্র সাথী, একমাত্র ভালবাসার বস্তু, যে চুষী লইয়া তাঁহারা তাহাদের প্রাণবন্ধুর প্রকৃষ্টরূপ সেবা করিবে, যে চুষী চুষিয়া শ্রীহরিপুরুষ প্রতিনিয়ত অপার আনন্দপয়োধিনীরে ডুবিয়া ভাসিয়া মহামহাভাব-দশা-মাধুরী আস্বাদন করেন; এবার প্রকট লীলায় সে চুষীটি কোথায় লুকাইল? চতুর ভক্ত তাই চুষীর রূপান্তর বলিতেছেন। রূপান্তর অর্থ অন্যরূপ অর্থাৎ স্থূলরূপে না বুঝিয়া যদি মূল ধরিয়া সত্যিকার চুষীকে চিনিতে চাও, তবে এই ত্রিকাল গ্রন্থের সূত্র দুটি জানিয়া লও। তথাহি শ্রীহস্তলিখিত সূত্র— **"একান্নরাগে মহানাম গান করিতে হয়"**

"মহাউদ্ধারণকে মহানাম কহে॥"

চুষীকে মহাউদ্ধারণরস কহিয়াছি। সেই মহাউদ্ধারণ রসের স্বরূপ '**মহানাম**'। সেই মহানাম কি? তথা শ্রীত্রিকাল সূত্র—"মহানামের প্রথম নাম জগদ্বন্ধু নাম, মহানামের মধ্যনাম পুরুষ, মহানামের শেষ নাম হরি।" শ্রীশ্রীত্রিকাল গ্রন্থ নিত্যতত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন; শ্রীচন্দ্রপাত প্রকট-তত্ত্ব বিজ্ঞাপন করিতেছেন। তাই ত্রিকাল গ্রন্থের মতে মহানাম "জগদ্বন্ধু পুরুষ হরি"। আদি—অনাদির আদি সর্ব্বশেষতত্ত্ব "জগদ্বন্ধু", তারপর পুরুষ-রূপ, তারপর হরিনাম। দক্ষিণ দিক

হইতে ১২৩ লিখিয়া বামদিক হইতে দেখিলে ৩২১ বলিয়া পড়িতে হয়। নিত্য-তত্ত্ব লীলায় থাকিয়া অনুভব করিলে ঐরূপ হয়, তাই লীলায় উল্টাধারা, প্রকটলীলা নিত্য লোকের বিপরীত প্রতিচ্ছায়া। সেইজন্যই চন্দ্রপাত গ্রন্থে বিপরীত ক্রম। আগে হরিনাম, তারপর পুরুষ-রূপ তারপর প্রকটবিগ্রহ "জগদ্বন্ধু"। নিত্যতত্ত্ব চিন্তার অতীত—তাই প্রকট লীলা-স্বরূপই ভজনীয়। অতএব "হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু" এইই মহানাম। ইনিই একাত্ম-রাগ প্রসবিনী। অতএব শ্রীচুষীর রূপান্তরে আমরা পাইলাম—

"হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু"

এই শ্রীমহানাম—আর শ্রীকরতাল ও শ্রীমৃদঙ্গ ইহাই চুষীর রূপান্তর, অথবা সুরসাল করতাল ও মধুর মৃদঙ্গ সহযোগে একাত্মরাগে অবিরত মহানাম কীর্ত্তন—ইহাই চুষী।

তাথৈ—পদদ্বারা একটী অসীম অনন্ত পরিপূর্ণ প্রেমভাব প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রেমোন্মাদ অবস্থায় লক্ষ কণ্ঠে সমকালে অগণিত মৃদঙ্গ করতাল সংযোগে শ্রীশ্রীমহানাম মহাকীর্ত্তন—ইহাই চুষীর স্বরূপ। এই পর্য্যন্ত চুষী-পরিচয় বা চুষীর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

এখন চুষীর আবরণের কথা। পূর্ব্বে যে সকল স্বরূপাবরণের কথা বলিয়াছি তাহা হইতে চুষীরূপা এই আবরণের একটু অভিনবত্ব আছে। সর্ব্বপ্রকার বস্তুর স্বরূপই আবৃত।

"মহামণ্ডলে আনন্দ হয়।   চতুর্দ্দশ মর্দ্দলে অশ্রু হয়।"

"একাম-রাগ-প্রবর্ত্তিনী, কপায়ূরে করতাল মৃদঙ্গ হাতে।"

সে আবরণ বহিঃপ্রকৃতি বস্তুর উপর অর্পণ করিয়াছেন। আর শ্রীহরিপুরুষের এই যে আবরণ, তাহা তিনি নিজেই রচনা করিয়া নিজকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন অথবা নিজেই নিজের আবরণ হইয়াছেন। নিজ অন্তর্নিহিত অনন্ত সুমাধুর্য্য তিনি নিজেই আস্বাদন করিতে চাহিতেছেন। নিজেই নিজের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় হইতেছেন। জ্ঞাতারূপে অনন্তানন্তময় স্বপ্রকাশ চাঁদযুক্ত অম্বর, আর আবরণরূপে আকাশজোড়া মেঘমালা। জ্ঞেয় জ্ঞাতার আবরণ হয়। কারণ জ্ঞেয় আছে বলিয়াই সে জ্ঞাতা বা জ্ঞাতৃত্ববিশিষ্ট। বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুমাত্রেই আবৃত। বিশেষণ বস্তুর প্রকৃতরূপকে ঢাকিয়া রাখে। পূর্ব্বে চালিতাবৃক্ষের দৃষ্টান্তস্থলে ইহা উল্লেখ করিয়াছি, তুমি কাহাকেও দেখিবার কালে যদি তাহাকে না দেখিয়া দর্পণে তৎপ্রতিবিম্ব দর্শন কর, তবে যেমন ঠিক মানুষটীকে দেখা হয় না, তদ্রূপ কোন বিশেষণ-বিশিষ্ট বস্তুকে দেখিলে প্রকৃত বস্তুকে স্বরূপতঃ দেখা হয় না। অতএব চুর্ষীরূপা জ্ঞেয়ের বিদ্যমানতাহেতু আজ শ্রীহরিপুরুষ তজ্জ্ঞাতৃত্ব বিশিষ্ট হইয়াছেন। এই জ্ঞাততা তাঁহার আবরণ। পরম্পরা সম্বন্ধে জ্ঞেয়ই আবরণহেতু বা আবরণস্বরূপ। জ্ঞেয় চুর্ষী তাহাই অম্বরের আবরণ। কাদম্বিনী অম্বরকে আবৃত করিতে পারে তাই তৎসহ চুর্ষীর তুলনা হইতেছে, মূলকথা অনন্তানন্তময় রসমাধুর্য্যবারিধি শ্রীশ্রীহরিপুরুষ আপন মনে আপনাহারা—

তাহাই ভাবুকের ভাষায় পরমশিশুর অমিয় চুষী আস্বাদন, রসিকের ভাষায় মহারাধাসহ মহারাস বিলাস, আর তাহাই কবির ভাষায়-চাঁদমণি বন্ধুর কাদম্বিনীর আড়ালে আত্মসঙ্গোপন।

তুমি এখন চাঁদ বা আকাশ কিছুই দেখিতে পাইবেনা। সুদূর ঋষিযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত কেহ দেখিতে পায় নাই, কেবল সেই ভূমার একটু আভাষ পাইয়া কখনও বা সবিশেষ কখনও বা নির্ব্বিশেষ গাহিয়াছেন। সেইজন্যই বেদমন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত কুত্রাপি প্রাধান্যতঃ শ্রীহরিনামতত্ত্ব আলোচিত বা বিশ্লেষিত হয় নাই। সে মধুমাধুরী চির আবৃতই রহিয়াছে। কেবলমাত্র চুষী জ্ঞেয় হইয়াও জ্ঞাতাকে আস্বাদন করিতেছে—কাদম্বিনী সাজিয়া নিজে আবরণ হইয়াও আবৃতকে নিত্যকাল সন্দর্শন করিতেছে। আর আজ মাধুর্য্য বিন্দুর কবি, সে কাদম্বিনীর পার্শ্বে রহিয়া আবরণ ও আবৃত এই দুইয়ের লীলা মাধুরী উপভোগ করিতেছেন।

কাদম্বিনীর দুইটী স্তর, দুই স্তরের দুইটী বৈশিষ্ট্য—সুমাধুর্য্যত্ব আর সুভগত্ব। পরম রমণীয় মাধুরীযুক্ততা আর পরম শোভন ঐশ্বর্য্যপূর্ণতা। অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনীর বৃষ্টিধারাও অবিরত ঝরিতেছে। রসিক কবি মধুলুব্ধ, তাই কেবল সুভগ পদ দ্বারা তাহা ইঙ্গিতে জানাইয়া তদ্‌বর্ণনাকে উপেক্ষা করিয়া অসমোর্দ্ধ

রস মাধুর্য্যের মুখ্য বৃষ্টিত্রয় সূত্রাকারে বর্ণনা করিতেছেন। যথা,—

"প্রথম অমৃতবৃষ্টি রসগোরী
ধ্রুবতারা নিতাব ভাব নিছনী।"

নিছনী—বালাই, পরাকাষ্ঠা। অমৃতস্বরূপ রসধারা প্রথমতঃ দুইরূপে প্রকাশমান হইলেন;—রস আর ভাব। রসের পরামূর্ত্তি গোরা। ভাবের পরাকাষ্ঠা নিতাই। তথা শ্রীমতীসংকীর্ত্তনে,—

"ভাবপ্রেষ্ঠ আবিষ্ট নিতাই"

অমৃত যখন আস্বাদনীয় হয়, তখন তাহাকে রস কহে। সেই রসের প্রতি রসরাজের যে অপরিমিত অনুরাগ, তাহা যখন স্বসংবেদ্যদশাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয় তখন তাহাকে ভাব বলে। পরমামৃত স্বরূপ মধুমাধুর্য্য বিগ্রহ শ্রীশ্রীহরিপুরুষ, তিনিই আপনাকে আপনিই আস্বাদন করিতে মহারাধাস্বরূপা চুযীকে নিজ হইতে পৃথক্ করিয়া চুযীতেছিলেন। এই যে আস্বাদ্যমান চুযী ইহাই রস। এই রসের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ। স্বীয় রসাস্বাদন বিষয়ে শ্রীশ্রীহরিপুরুষের যে অনন্ত অনুরাগ তাহারই জাজ্বল্যমান মূর্ত্তি শ্রীনিত্যানন্দ। দুটী ভাই অবিরাম ঐ শ্রীহরিপুরুষের মহাউদ্ধারণ রসসিন্ধুতে ভাসমান। রসিক নাগর বর হরিপুরুষ শ্রীবন্ধুসুন্দর তেমনি অবিরাম শ্রীনিতাই গৌর মিলিতাঙ্গ শ্রীমহাউদ্ধারণ চুযীরসে নিমজ্জমান। ঐ দেখ

"হা নিতাই" "হা গৌরাঙ্গ" "হা চৈতন্য নিতাই" "বন্ধু কবে যাবে নদীয়ায়, দুভাই অন্বেষণে" "এস গৌর নিত্যানন্দ স্মরণকীর্ত্তন কন্দ হে" গাহিয়া গাহিয়া নয়ন ধারায় বক্ষ প্লাবিত করিতেছেন। শ্রীহরিকথা শ্রীমতীসংকীর্ত্তন এই দুই মহাগ্রন্থ যেন সেই নয়ন জলে সিক্ত হইয়া রহিয়াছেন। অগণিত ভক্ত হৃদয় তাহাতে নিমগ্ন হইয়া মহাউদ্ধারণের মহাধর্ম্ম পথে সর্ব্বারাধ্য শ্রীহরিপুরুষের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, স্বয়ং শ্রীমুখে ঐ সকল শ্রীগ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন "প্রভুর গ্রন্থ উদ্ধারণ ও মহাউদ্ধারণ।" "হরিকথা মহাউদ্ধারণ গ্রন্থ, হরিকথা পাঠে তোমরা নির্ম্মল ছাপ সাদা বরফের মত ধব্‌ধবে হয়ে যাবে; কৈতব থাক্‌বেনা।" তথা শ্রীহরিকথায় শ্রীনিতাই মাধুরী :—

"প্রভুনিত্যানন্দ চন্দ্র করভ-বিক্রম
আজানুলম্বিত ভুজকল্পতরুসম।"

"ধ্রুবতারা"—রস আর ভাব। রসের রসত্ব ভাবেতে পরিব্যক্ত; ভাব রস-সমাশ্রিত। গৌরের গৌরত্ব নিত্যানন্দে পরিব্যক্ত। নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রগত। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রসলোলুপ, গৌররূপে সে রস মূর্ত্তিমান হইয়াছেন। অনন্ত গতিতে অনন্ত অক্ষৌহিণী আকুল হৃদয় সে রসের সন্ধানে ছুটিতেছে; ভাবমূর্ত্তি নিতাই সে রসের ভাণ্ডারী—রসাধিকারী, তথা শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীপদ;—

"মহানন্দ নিত্যানন্দ ভাবে টলমল।" "নিত্যানন্দ পতিত পাবন, জীবের দুর্ল্লভ ধন করে বিতরণ।" "নাম নৌকা নিতাই কাণ্ডারী, ভারে ভারে যায় পারে পুরুষ নারী" অতএব রসময় শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রকে আস্বাদন করিতে হইলে দয়াল নিতাইচাঁদকে ধ্রুবলক্ষ্য করিয়া ছুটিতে হইবে। তাই নিতাইকে ধ্রুবতারা কহিয়াছেন। ঐ দেখুন ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করিয়া সভক্তবৃন্দ রসময় কি মনোমোহন নৃত্য করিতেছেন !!

ঐ নিতাই চাঁদ নাচিছে।
নয়নে বারিধারা ঝরিছে॥
আহা, বামে গৌর গদাধর তমোরাশি নাশিছে।
আহা, চারিদিকে ভক্তগণ মঙ্গল গাহিছে॥
আহা, হরিদাস সীতানাথ প্রেম সুধা ঢালিছে।
আহা, নিত্যানন্দের হুহুঙ্কারে ত্রিভুবন কাঁপিছে॥

তুমি শুদ্ধ শান্ত পাপমুক্ত হও, কিন্তু দয়াল নিতাই চাঁদ কৃপা না করিলে কি করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের চরণ স্পর্শ করিবে ঐ দুর্ল্লভ ধন শ্রীহরিনাম দ্বারা সর্ব্বপাপ কালিমা মুক্ত করিয়া জগাই মাধাইকে লইয়া কে ঐ গৌরচরণে সমর্পণ করিতেছেন?—

"হরিনামে মুক্তপাপ জগাই মাধাই।
গৌরপদে করে দান দয়াল নিতাই॥"

নিতাই ধ্রুবতারা—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র শান্তিদাতা। জীব শান্তিহারা। তাই নিত্যানন্দ জীবের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র আরাধনীয়, কারণ,—

"যেদিগে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয়।
সেইদিগে মহাপ্রেম ভক্তি বৃষ্টি হয়॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত। অন্ত্য
৫ম পরিচ্ছেদ।

শ্রীনিত্যানন্দের করুণাকটাক্ষ হইলেই মহাপ্রেম ভক্তি-ধারায় সুশীতল হইবে, তবেই রসনায়ক শ্রীগৌরের রস মাধুর্য্য উপলব্ধি হইবে। আর সেই গৌরনিতাই সম্মিলিত মাধুর্য্যই মহাউদ্ধারণ অমৃতস্বরূপ। শ্রীশ্রীপ্রভুও সেইজন্যই লিখিয়াছেন,— "প্রেমানন্দ নিত্যানন্দ পতিত ঈশ্বর।"

"চৌদ্দভুবনময় নিতাই বিক্রম।"
"জয় জয় নিত্যানন্দ উদ্ধার সিদ্ধি।
অযাচিত দয়াধার কারুণ্য ঋদ্ধি॥"
"জয় জয় প্রাণচন্দ্র নিত্যানন্দ রাম"
কমন কারুণ্যনিধি আনন্দধাম॥"

নিতাই ধ্রুবতারা। নিতাই আচণ্ডালে প্রেমদাতা। নিতাই কাঙ্গালবেশে কাঙ্গালের আশ্রয়।

"কেরে কাঙ্গালের বেশে যাচিয়া বেড়ায়।
প্রেমদাতা নিতাই বুঝি এসেছে এ নদীয়ায়॥"

"নিতাই নিতাই নিতাই ব'লে চল নদীয়ায়—
যদি শচীর ঘরে নয়নভ'রে হের্‌বিরে গৌরাঙ্গ রায়।"
"আচণ্ডালে দিয়ে কোল, বলে ভাই হরিবোল।"
বিনামুলে বিকাইব ভজ গোরারায় রে॥"

নিতাই ধ্রুবতারা। কারণ নিত্যানন্দকে লক্ষ্য করিয়া না চলিলে গৌরপ্রেম সুধারস কুত্রাপি ভাগ্যে ঘটিবে না। এই যে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের শ্রীমুখ-বাক্য।

'নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
দাস হইলেও সে মোর প্রিয় নহে॥' মধ্য ২০শ।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়বর্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একমাত্র নিত্যনন্দ।

'জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রিয়তম।
ত্রিজগতে আর কেহ নাহি তোমা সম॥

শ্রীনিত্যানন্দ কেবল গৌরমণ্ডলের ধ্রুবতারা নহেন—মণ্ডলেশ্বর শ্রীগৌরচন্দ্রেরও তিনি ধ্রুবতারা। শ্রীগৌর ছুটিয়াছেন নিতাইকে ধরিবেন, শ্রীনিতাই ছুটিয়াছেন শ্রীগৌরকে জানিবেন। শ্রীগৌর নিতাই দুই মিলিয়া ছুটিয়াছেন শ্রীহরি পুরুষকে আস্বাদন করিবেন। শ্রীহরিপুরুষ চাহিতেছেন শ্রীগৌর-নিতাই মিলিতাঙ্গ মহাউদ্ধারণ চুষীরস চুষিবেন। ইহাই চমৎকার লীলা রহস্য—আরও রহস্য এই যে কেহ কাহাকেও জানিতে পারেন নাই। যে যাহাকে জানিতে চায় সে তাহাকে

জানিতে পারে না, জানিলে আর জানা হয় না। ভাবের কিনারা পাওয়া গেলে রসপ্রবাহও যে রুদ্ধ হইয়া যায়। তাই অনন্ত ভাবময় শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরেরও গোপনীয় বস্তু। তৎপ্রমাণ যথা—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

"প্রভু বোলে কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস।
নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতেক বিশ্বাস॥
মোর গোপ্য নিত্যানন্দ জানিলে সে তুমি।
তোমারে সন্তুষ্ট হয়্যা বর দিব আমি॥" মধ্য ৮ম।
"রাঘব পণ্ডিত প্রতি শ্রীগৌর সুন্দর।
নিভৃতে কহিলা কিছু রহস্য উত্তর॥
রাঘব তোমারে আমি নিজ-গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বই॥
এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন্ আমারে।
সে-ই আমি করি এই বলিল তোমারে।
আমার সকল কর্ম্ম নিত্যানন্দ দ্বারে।
এই আমি অকপটে কহিল তোমারে॥
যেই আমি সেই নিত্যানন্দ ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই॥ অন্ত্য ৫ম।

কখনও দেখি সুরধুনী তীরে প্রেমের ঠাকুর শ্রীগোরাচাঁদ চলিয়াছেন আপন মনে, আর ভাববিহ্বল নিতাইচাঁদ রহিয়াছেন দক্ষিণে হেমচ্ছত্র ধরিয়া, আবার কখনও দেখি

প্রেমদাতা শ্রীনিত্যানন্দ অগ্রসর হইতেছেন—মল্লবেশে, শিরে পাখা ধরিয়া শ্রীনিমাই চলিয়াছেন পিছে পিছে।

"স্বপ্নে দেখে মহা ভাগবতের প্রধান।
মল্লবেশে নিত্যানন্দ চলে আগুয়ান॥
নিত্যানন্দ মূর্ত্তি দেখে যেন হলধর।
শিরে পাখা ধরি পাছে যায় বিশ্বম্ভর॥
স্বপ্নে প্রভু হাসি বোলে "জানিলা মুরারি।
আমি যে কনিষ্ঠ মনে বুঝহ বিচারি॥" মধ্য ২০শ

তত্রৈব—"মোর দেহ হ'তে মোর নিত্যানন্দ দেহ বড়।
তোমা সবাস্থানে এই কহিলাম দঢ়॥"

তথা—শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীপদ শ্রীমতি সংকীর্ত্তনে—

"জয় গৌরাগ্রজ মহাভুজ ভানুজ বারণ।"
"হরি ব'লে বাহুতুলে, নাচেরে নিতাই।
দক্ষিণে আনন্দ ভরে হা রে নিমাই॥"

কাজেই কে বড় কে ছোট বুঝিনা, কে আগে কে পিছে আছেন জানিতে পারি না—তবে এই সার কথা জানিয়া ভক্ত প্রকাশ করিতেছেন—একটী ধারা দুইটি ভাগ—সমান দুইটী ভাগ, 'এক বস্তু দুইভাগ ভক্তি বুঝাইতে'। ভেদ অনেক আছে, নতুবা দুই বলিবার তাৎপর্য্য কি? পক্ষান্তরে ভেদ মোটেই নাই, থাকিলে আর একই অমিয়চুষী হইতে প্রকাশ বলিবার বিশেষত্ব কি—এই ভেদাভেদ রহস্যময়।

গৌর না ভজিলে নিতাই বুঝিবেনা, নিতাই না বুঝিলে গৌর চিনিবে না—নিতাইগৌররসসাগরে ডগমগ না হইলে মহাউদ্ধারণ রস আস্বাদন করিতে পারিবে না। শ্রীশ্রীমহা-উদ্ধারণ চুষী রসের এই প্রথম প্রকাশ।

"হা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মহা উদ্ধারণ।"

এই পদে শ্রীশ্রীপ্রভু, শ্রীমনমহাপ্রভুকে 'মহাউদ্ধারণ" লিখিয়া এই তত্ত্বই পরিব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ যুগল মিলনই মহাউদ্ধারণ রসস্বরূপ। এইবার এই যুগল রসতত্ত্বের দ্বিতীয় বৃষ্টির মাধুর্য্যানুভব করিব।

যথা :— দ্বিতীয়ামৃত বৃষ্টি বংশী আলাপ।
নন্দের বালা শ্রীললিতা পদ্মিনী।
উদ্ধারণে শৈব্যা বিগ্রহ কমন।
জড়িত রাধা মহাভাব দামিনী।

নিত্য লীলাময় শ্রীশ্রীহরিপুরুষ নিত্যকাল নিত্যচুষী শ্রীমহা-উদ্ধারণ রসে বিভোর আছেন। প্রপঞ্চে প্রকাশিত হইবার কথা কোনও দিনও ভাবেন নাই। "বংশী আলাপ" পদটী প্রয়োগ দ্বারা রসিক কবি রসরাজের একটী বাসনার কথা ইঙ্গিতে জানাইতেছেন। সেটী জগজ্জীবসহ মিলনেচ্ছা। বংশী সেই মিলনের দ্বারস্বরূপ।

জীব অবিরত মহামায়ার কলরবে বধির। মধুর মুরলীর ঝঙ্কার দিয়া মুরলীধারী তাহাদিগকে উন্মুখ করিয়া নিজ নিত্যদাস

জীবকে নিত্যস্বরূপে স্থিত করেন। ব্রজবাসী কুল-ললনাগণ পথ প্রদর্শক। তাহারা ঐ প্রেম মধুময় বংশীধ্বনি লক্ষ্য করিয়া আলুথালু বেশে পাগলিনী পারা ছুটিয়া যায় অজ্ঞজীব শতই কেবল তাহাদের পদাঙ্ক ধরিয়া অগ্রসর হয়। তাহাই বলিতে ছিলাম বংশী মিলনের সেতু। প্রাণবল্লভের শ্রীচরণ প্রান্তে পৌছিতে মাঝে যে বিপুল বাধা—বাঁশরীর ধ্বনি তাহা চূড়মার করিয়া দেয়।

কুল-ললনার ধৈর্য্য বিষধর সর্প সদৃশ—বংশী গরুড় হইয়া তাহা দমন করে, তাহাদের লজ্জা ভীষণ ব্যাধিসদৃশ বংশী ধন্বন্তরি হইয়া সে ব্যাধি নাশ করেন। সাধ্বী রমণীগণের গর্ব্ব সাগর সদৃশ। বংশী অগস্ত্য সাজিয়া তাহা গণ্ডুষে পান করিয়া ফেলেন।

এষ স্থৈর্য্য ভুজঙ্গ সংঘ-দমনানঙ্গে বিহঙ্গেশ্বরো
ব্রীড়া ব্যাধিযুক্ত বিধুননবিধৌ তন্বঙ্গি ধন্বন্তরিঃ।
সাধ্বী গর্ব্বভরাম্বুরাশি চুলুকারম্ভে কুম্ভোদ্ভবঃ
কালিন্দীতট মণ্ডলীষু মুরলীতুণ্ডার্দ্ধ নির্ধাবতি॥

জীবসহ তাহার মিলন ইচ্ছা বা প্রপঞ্চে প্রকট হইবার গুপ্তবাসনা যে স্ফুটনোন্মুখ হইয়াছে, বংশী আলাপ পদ-দ্বারা ভক্ত তাহার ইঙ্গিত করিতেছেন। দ্বিতীয় অমৃত বৃষ্টি হইতে বংশীসহ বংশধারী নন্দদুলাল প্রকাশ হইলেন। সঙ্গে আর কে কে আসিলেন, তাহা পরে বলিব; আগে বংশীটি

দ্বারা কোন রাগিণীতে আলাপ হইতেছে তাহাই শুনিয়া লই।

শ্রীল রূপ গোস্বামি পাদ লিখিতেছেন, চন্দ্রাধরে মুরলীটি ধরিয়া আমার শ্যামচাঁদ যখন পঞ্চমরাগে সুরের হিল্লোল তুলিয়া দেন তখন বড়ই আশ্চর্য্য হয়।

"আশ্চর্য্যং হন্ত পরস্পর বিপর্য্যস্ত স্বভাবানামপি
ভাবানাং ধর্ম্মবিপর্য্যয়ঃ"

প্রতিকূল স্বভাব বস্তুসমূহ স্বপ্রতিকূল ধর্ম্মীতে স্বধর্ম্ম সমর্পণ করিয়া তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করে। যমুনার জলরাশি তরল পদার্থ, বংশীধ্বনি শুনিয়া সেই জলরাশি স্থির স্তম্ভিত হইয়া কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। গিরিরাজ গোবর্দ্ধন কঠিন বস্তু। মুরলীর রব শুনিয়া প্রস্তর সমূহ দ্রবভাব লাভ করতঃ মৃদুতা ধারণ করে। জঙ্গমগণ স্থাবর ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, আর স্থাবর সকল মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে থাকে।

জাত স্তম্ভতয়া পয়াংসি সরিতাং কাঠিন্যমাপেদিরে,
গ্রাবাণো দ্রবভাব সম্বলনতঃ সাক্ষাদমী মার্দ্দবং।
স্থৈর্য্যং বেপথুনা জহু র্মুহুরগা জাড্যাদগতিং জঙ্গমাঃ,
বংশীং চুম্বতি হন্ত যামুনতটী ক্রীড়াকুটুম্বে হরৌ॥ ৪॥

বংশী আলাপ পদটী তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বদ্ধ; বংশীদ্বারা আলাপ। বংশী আলাপ শুনিলে ধেনু সকল পরমসুখানুভব করতঃ উর্দ্ধকর্ণে নাদাভিমুখে প্রধাবিত হয়; তাহাদের স্তন

হইতে প্রচুর ক্ষীর ধারা স্রাবিত হইয়া নবকুসুমলতা সমূহকে সিঞ্চন করে। ঐ যে,—

আহা ঐ বাঁশরী বাজিল।
ধবলী উল্লাসে সাজিল॥

আহা! ললিতা চম্পক লতা রাই বেশ রচিল।
আহা! সখীগণে সম্মিলনে সোহাগিনী চলিল॥
আহা! নীপশিরে পিকবর পঞ্চম গাহিল।
আহা! যমুনা আনন্দমনা উজান বহিল॥
আহা! সখীগণ অগণন বৃন্দাবনে পশিল।
আহা! যুগলে মাধবীতলে সবে মিলে ঘিরিল।
আহা! বন্ধু বলে ধরাতলে রতিপতি পড়িল॥

এক বংশী আলাপে এতলীলা শ্রীব্রজে প্রকট হইবে জীব অচিরেই সে মুরলীর নাদ শ্রবণে ধন্য হইয়া প্রাণপতির দিকে অগ্রসর হইবে, এই আভাস দিবার মানসে নিত্যলীলা বর্ণনপর হইয়াও আত্মহারা ভক্ত "বংশী আলাপ" পদটী প্রয়োগ করিতে ভুলেন নাই। শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ মিলিতাঙ্গ মহাউদ্ধারণ রস স্বরূপা চুর্যীর দ্বিতীয় প্রকাশ, বংশীধারী শ্রীনন্দ দুলাল, তাঁহার এক দিকে শ্রীললিতা ও পদ্মিনী শ্রীরাধা, অপর দিকে শব্যাদিযুথসহ কমনবিগ্রহ শ্রীচন্দ্রাবলী।

এ সকল তত্ত্ব ক্রমে আস্বাদন করিব, তৎপূর্ব্বে গোরাকে গোরী বলিবার ও নন্দলালকে নন্দের বালা বলিবার গূঢ় রহস্য

ভেদ করিতে প্রয়াস পাইব। পূর্ব্বে বলিয়াছি চুষী মহাউদ্ধারণ-রাসরসেশ্বর শ্রীহরিপুরুষের বিলাস-সামগ্রী। পরম রমণীয় অমিয় চুষীতে বিশ্বরমণ শ্রীহরিপুরুষ বিহার করেন। তাই চুষী যতবার যতরূপে আমাদিগকে দেখা দিয়াছে, সর্ব্বত্রই তাহাতে মহাভাবময় 'উদ্ধারণ প্রকৃতি' ভাব আরোপিত হইয়াছে। এইজন্য গোরা না বলিয়া বলিয়াছেন "গোরী", বাল না বলিয়া বলিতেছেন "বালা"। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ ইহাই শ্রীবৈষ্ণব সিদ্ধান্ত। শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে "গোরী" ও "বালা" বলিয়া শ্রীশ্রীহরিপুরুষের মহাভাবময় 'উদ্ধারণ প্রকৃতি' স্বরূপ বর্ণনা করায় চিরসিদ্ধান্তিত তত্ত্বের বৈপরীত্য হইল, এরূপ মনে করিবেন না।

কারণ, পুরুষ-প্রকৃতি এই শব্দদ্বয় আপেক্ষিক শব্দ (Relative term)। 'আস্বাদন' এই শব্দটী শুনিলেই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধিত তিনটী বস্তুর কথা আমাদের মনে আসে। যখন বলি, আমি মধু আস্বাদন করিতেছি, তখন আমি, মধু ও রসানুভব এই তিনটী বস্তুর কথা আমাদের মনে আসে। রস মাত্রেরই আশ্রয়ালম্বন ও বিষয়ালম্বন আছে। বিষয় ও আশ্রয় এই আলম্বনদ্বয় না থাকিলে রস রসত্ববিহীন, পক্ষান্তরে রস না থাকিলে বিষয় ও আশ্রয় অর্থহীন হইয়া থাকে। সংসারের প্রত্যেক বস্তুই প্রমিতির বিষয়। প্রমাতা ও প্রমেয় থাকে বলিয়াই প্রমিতি হয়। দর্শনের ভাষায়

বলিলে ঐ প্রমাতাই পুরুষ। প্রমেয় প্রকৃতি, প্রমিতিই রস। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে প্রমেয়ত্ব ও প্রমাতৃত্ব বস্তুর স্থিরধর্ম্ম নহে, তুলনা মূলক। কোন না কোন বস্তুতে ঐঐ ধর্ম্ম স্থির আছেই। ইহাই দার্শনিকের অনুমান,আর তৎ তৎ অনুসন্ধানেই সর্ব্ব দর্শনপুরাণের পর্য্যবসান। সাংখ্যাচার্য্যগণ একমাত্র জীবাত্মাকেই পুরুষ সাব্যস্ত করিয়া পরিশিষ্ট চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে প্রকৃতি ও তাহার পরিণাম স্থানীয় সাজাইয়াছেন। কিন্তু পুরুষ-বহুত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বৈদান্তিকগণ মহাকাশ ঘটাকাশ দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া অসংখ্য জীবাত্মারূপ অসংখ্য পুরুষের অসংখ্যেয়ত্ব ভ্রমজ্ঞানজাত প্রমাণিত করিয়াছেন ; ও অনন্তবিশ্বকে এক ব্রহ্মবিবর্ত্ত সিদ্ধান্ত করিয়া পরব্রহ্মকেই একমাত্র পরমপুরুষ ধরিয়া লইয়াছেন। মদ্ভাগত দেখিলেন, জীব অনন্ত সর্ব্বব্যাপী হইলে শ্রীভগবানের সহিত সাদৃশ্য প্রযুক্ত ভগবৎ নিয়ন্ত্রিত্ব থাকে না।

অপরিমিতা ধ্রবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা।
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।

কাজেই শ্রীমদ্ভাগবত জীবকে তটস্থা শক্তিমাত্র কহিয়া 'ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে' শ্লোকে তিনটী এক বস্তু স্বরূপেরই ত্রিবিধ প্রকাশ, অনুভব বৈলক্ষণ্য-হেতুক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ও "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"

এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ব্রহ্ম-সংহিতা ব্রহ্মকে শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গকান্তি কহিয়া সমাধান করিয়াছেন, কোটী কোটী জগতে যাঁহার সেই কান্তি কোটী কোটী রূপে ভাসমান, তাঁহাকেই আদি পুরুষ গোবিন্দ জানিয়া প্রণত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীপ্রভু ইহার কোনটিই সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করেন নাই, ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে প্রকৃতি কহিয়াছেন। যথা ঃ—

"এই পরমাত্মাই প্রাকৃত রাজ্যের শেষ সীমা।" শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম এই তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন, যথা—"পরমাত্মা ব্যাপ্তিরূপে বিশ্বের সর্ব্ববস্তুতে জল, বায়ু, ক্ষিতি, তেজ, আকাশ, অণূ ও পরমাণূতে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিরাজমান।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ধারণা স্বতন্ত্র, কৃষ্ণ মায়ায় অতীত বস্তু, মায়িক সৃষ্টির সহিত কৃষ্ণের লেশ মাত্র সম্পর্ক নাই, কৃষ্ণ একলেশ্বর স্বতন্ত্র ঈশ্বর।" শ্রীশ্রীপ্রভু ব্রহ্মের একত্ব স্বীকার করেন নাই, যথা, "পরমাত্মা এক নহে, বহু। যেমন এই একটী সৃষ্টি সংসার তেমনি কৃষ্ণের অনন্ত অক্ষৌহিণী সৃষ্টি সংসার আছে। যেমন এই সৃষ্টি সংসারে একটী বিরাট একটী তুরীয় একটি ব্রহ্ম ও একটী পরমাত্মা আছেন, তেমনি এই অনন্ত অক্ষৌহিণী সৃষ্টি সংসারে **অনন্ত অক্ষৌহিণী সংখ্যক বিরাট তুরীয় ব্রহ্ম ও পরমাত্মা আছেন।**

শ্রীশ্রীপ্রভু ব্রহ্মের নিত্যত্ব মানেন নাই। যথা ;—

"পরমাত্মা স্বয়ং স্রষ্টা হইলেও সৃষ্ট মাত্র, মহাপ্রলয়ে লয় হয় ॥

শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুহরির এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ফলবলাৎ বৈদান্তিকের ব্রহ্মের পরমপুরুষত্বও খণ্ডিত হয়। ব্রহ্ম বহু হইলে সাংখ্যের বহুপুরুষত্বই ফিরিয়া আসিল। এবং মহাপ্রলয়ে লয় হইলে অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইল। বহু অনিত্য পুরুষ দেখিয়া দার্শনিকের সুখ হয় না। একেতে পর্য্যবসান না হওয়া পর্য্যন্ত অনুসন্ধানের নিবৃত্তি নাই। তাই অনন্ত অক্ষৌহিণী সংখ্যক ব্রহ্ম তুরীয় ও পরমাত্মার ধ্যেয় বস্তু কৃষ্ণই পরমপুরুষ এই পর্য্যন্ত বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল। তারপর চারি হাজার বৎসর পরে যে দিন দেখিলাম, রাধা শ্যাম এক-তনু হইয়া রা রা বলিয়া নদীয়ার পথে ধুলায় লুটাইতেছেন তখন চরমভোক্তৃত্ব বা পরমপুরুষত্ব আমরা তাঁহাতেই অর্পণ করিয়াছি "রাধাকৃষ্ণ মিলিতাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ", এই কথাটী বুঝিবার জন্য ধরিয়া লইয়াছি, বস্তুতঃ মুলতত্ত্ব শ্রীগৌরনিতাই ; তাহা হইতেই ব্রজলীলায় বিকাশ। দুটী ভাই পর-তত্ত্ব, নিত্যসত্যবস্তু। তাঁহাদেরই অনন্তলীলা বিলাসের একাংশ, ব্রজলালা; প্রথম বৃষ্টি শ্রীনিতাইগৌর,তাহা হইতে দ্বিতীয় বৃষ্টি। দ্বিতীয় বৃষ্টি হইতে নন্দদুলাল ও ললিতা প্রভৃতি সখাসখীবৃন্দ, তাই নন্দ নন্দনকে "বালা" বলিয়া গৌরের পরতত্ত্বতা বিজ্ঞাপন

করিয়াছেন। তারপর এবার শ্রীশ্রীহরিপুরুষ রসে বিভোর হইয়া তাঁহারই শ্রীলেখনী প্রমাণ বলেচ ন্দ্রপাত মাধুর্য্য-বিন্দুর প্রণেতা শ্রীশ্রীহরিপুরুষকেই পরমাতিপরম সর্ব্বাতীত অবিচিন্ত্য পুরুষ বলিয়া জানিয়া—গোরা না বলিয়া "গোরী" বলিয়াছেন। ফল কথা, কোনও শাস্ত্রের কোনও সিদ্ধান্তই ভুল নহে। আমি একটি ক্ষুদ্র জীব; কিন্তু আমাকে কেন্দ্র করিয়া যখন আমি এদিক ওদিক তাকাই তখন আমি আমাকেই প্রমাতা বা পুরুষ বলিয়া মনে করি। তেমনি পরমাত্মাকে কেন্দ্র ধরিলে এই একটী সৃষ্টি সংসারের যাবতীয় বস্তু বা জীবাত্মাকে প্রকৃতি বলিতেই হইবে।

তারপর শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যস্থলে রাখিয়া অনন্ত অক্ষৌহিণী সৃষ্টি সংসার পর্য্যবেক্ষণ করিলে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ আর সব দেবদেবী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে প্রাকৃত বলিয়া বুঝিতে পারি। তারপর যদি শ্রীগৌরের দিকে লক্ষ্য স্থির করিয়া শ্রীনিত্যানন্দের অযাচিত কৃপা-স্নাত হইয়া অনন্ত শ্রীব্রজ-মণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তবে শ্রীগৌরহরিই যে একমাত্র পুরুষ ইহা অনুভব করিতে পারি। তবে এখন কোন্‌টী সর্ব্বশেষ বস্তু, যাহাকে চরম কেন্দ্র বলিয়া জানিব। জীবের জানিবার সাধ্য নাই দেখিয়া ঐ শুনুন স্বয়ং কেন্দ্রাধিপতি নিজ পরিচয় কি জানাইয়াছেন ;—

"আমি সকলের কেন্দ্র"

"হরি পুরুষ উদ্ধারণ প্রকৃতি"।

"উদ্ধারণ অনন্ত বিগ্রহ"

"কোটী কোটীতে এক অনন্ত হয়।" "অনন্ত নামকে নাম কহে, অনন্তানন্ত নামকে মহানাম কহে।"

"আমাকে শুধু শ্রীকৃষ্ণ কিংবা শ্রীগৌরাঙ্গ বাললে চলিবে না, তবে কি আমি তা নই, তাই বটে, তবে তত্ত্ব অতি নিগূঢ়॥" এই নিগূঢ়তম তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধুসুন্দরের মহাউদ্ধারণ রস-মাধুর্য্যকণা অনুভব করিয়া অনন্ত গৌরমণ্ডল ও অনন্তানন্ত শ্রীব্রজমণ্ডলের অনন্ত অনন্ত বিগ্রহের দিকে তাকাইয়া কোথাও আর কাহাকেও পুরুষ বলিয়া দেখিতে বা বুঝিতে বা স্বীকার করিতে না পারিয়াই লিখিয়াছেন—

"কহে শিশুরাজ লাজে কিবা কাজ
সে যে যুবরাজ গৌর-ধ্যেয় মধুরাজ
মোহন-মোহন শিশু মহা মহাউদ্ধারণ।"

আজ সেই ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া "গোরী" ও "বালা" এই পদদ্বয় প্রয়োগ করিয়াছেন। বান্ধবগণ অনুগত হইয়া আস্বাদন করিবেন। বিরুদ্ধবাদিগণের সঙ্গে মিলিয়া ভ্রূকুঞ্চন করিবেন না। ঐ দেখুন না, শ্রীহস্তের জাজ্জ্বল্যমান অক্ষর কয়টি বুকে লইয়া সগৌরবে "চন্দ্রপাত" ঘোষণা করিতেছেন— এই যে পরিচয়—

"প্রভু প্রভু প্রভু হে—অনন্তানন্তময়"

একবারের পর দুইবার, দুইবারের পর তিনবার প্রভু বলিবার তাৎপর্য্য কি বুঝিয়াছেন ? অনন্তের উপর আবার অনন্ত পদ প্রয়োগ করিয়া কি ইঙ্গিত করিতেছেন ? যাঁহারা প্রভুকে প্রভু বলিয়া জানিয়াছেন তাঁহারা প্রভুর শ্রীচরণ বুকে ধরিয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন। জগতের অন্যান্য যাবতীয় বৈষ্ণব বান্ধবমণ্ডলী, যাঁহারা আমার উপর্য্যুক্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়া কাণে অঙ্গুলি দিয়া স্থান পরিত্যাগ শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগেরও চরণ ধরিয়া একটী নিবেদন করিব।

অনন্ত কোটী জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ধ্যেয় নিরুপাধি মাধুর্য্য বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ; এপর্য্যন্ত আপনার সঙ্গে একমত আছি।

তারপর রসরাজ আর মহাভাব দুই মিলিত হইয়া হইলেন শ্রীগৌরাঙ্গ—এপর্য্যন্ত উভয়ে স্বীকার করিয়াছি। তারপর আমি নূতন কথা বলিয়াছি বটে, আচ্ছা, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করিব। আপনার রসরাজ আর মহাভাব এই দুই মিলিয়া যদি হইলেন শ্রীগৌরাঙ্গ, তবে শ্রীগৌরানুগত হইয়া ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা অভিলাষ করেন কেন ? শ্রীগৌরচন্দ্র কি সেব্য-তত্ত্ব হইতে পারেন না ? শ্রীগৌর-নিতাই ভজন করিয়া হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করা হয় কেন ? শ্রীনিতাই গৌরের নাম কি জপনীয় হইতে পারেন না ? শ্রীগৌরচন্দ্রের পূজা করিতে

বসিয়া "ক্লীং কৃষ্ণায় বিদ্মহে, দামোদরায় ধীমহি তন্নঃ কৃষ্ণ প্রচোদয়াৎ" পাঠ করি কেন—"ক্লীং গৌরচন্দ্রায় বিদ্মহে বিশ্বম্ভরায় ধীমহি, তন্নোগৌর প্রচোদয়াৎ" বা "ক্লীং গৌরায় স্বাহা" উচ্চারণ করিলে হয় না কি? নিতাই নিতাই বলিয়া কাঁদিয়া শেষটায় "ক্লীং গোপীজন বল্লভায় স্বাহা' না বলিয়া "ঐং নিত্যানন্দায় স্বাহা" বলিলে ভাল হয় নাকি? "ঐং নিত্যানন্দায় বিদ্মহে, সংকর্ষণায় ধীমহি, তন্নোরাম প্রচোদয়াৎ কি গায়ত্রী হইতে পারেন না? শ্রীনিতাইর কৃপাস্নাত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমসুধা লোভে ব্রজের দিকে তাকাইয়া থাকা কেন? ঐ যে পাশেই শ্রীবিশ্বম্ভর আছেন, তিনি কি প্রাপ্য বস্তু হইতে পারেন না। এই সকল মিশ্রিত ভাবের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না, তাই অর্ব্বাচীনের মত এই সব নীরস প্রশ্নের অবতারণা করিলাম। শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুহরি যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার সার সঙ্কলন করিলে এই পাই ;—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবা করিবে তো শ্রীবৃন্দাবনে যাও। ব্রজে গিয়ে গোপীর আনুগত্য গ্রহণ কর। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ গায়ত্রী শ্রীগোপীমন্ত্র আছেন তাহাই ভাব, চিন্তা কর, অনুক্ষণ ধ্যান কর। **অহোরাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ অর্চ্চিও কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকিও কান্দিও গাইও জপিও সেবিও বাসিও আপন করিও।**

"ভজরে অবোধ মন নন্দের কানাই।
নীলাম্বর হলধর সুন্দর বলাই॥

ভজ শ্রীদাম সুবল লবঙ্গ মধুমঙ্গল
কিঙ্কিনী কুসুমাসব রাখাল সবাই ॥
ভজ গিরি গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড বৃন্দাবন,
ললিতা বিশাখা বৃন্দা বিনোদিনী রাই ॥
ভজ বৃষভানুপুর, নন্দগ্রাম সুমধুর
যাবট দ্বাদশ বন বন্ধু বলে তাই ॥
শ্রীমতী সংকীর্ত্তন

আর নবযুগল শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ ভজিবে তো,—
"নিতাই নিতাই নিতাই বলে
চল নদীয়ায়।
শচীর ঘরে নয়ন ভ'রে
হের্‌বিরে গৌরাঙ্গ রায় ॥
একাসনে গৌর গদাধর,
ললিত ত্রিভঙ্গরূপ অতি মনোহর ;
রাশি রাশি রবি শশীরে
পদ নখে শোভা পায়।
পাশে সব পারিষদগণ,
হরিদাস রামানন্দ রূপ সনাতন ;
প্রেমানন্দ নিত্যানন্দরে
আবেশে অবশকায়।

শোভে গৌরীদাস গোবিন্দ গোপাল
রামাই সুন্দরানন্দ শ্রীবাসদয়াল ;
সীতানাথ রঘুনাথরে
শ্রীজীব বন্ধু সহায় ॥"

শ্রীগৌরমন্ত্র শ্রীগৌরগায়ত্রী শ্রীনিতাইমন্ত্র শ্রীনিতাইগায়ত্রী রহিয়াছেন ; তাহাই স্মরণ কর, চিন্তন কর, চিন্তামণি শ্রীগৌড় মণ্ডলভূমি তাহাই কামনা কর। **"হৃদয়ে গৌরচন্দ্র জপিও, গৌর গদাধর ধ্যান করিও, স্বরূপ দামোদরে আত্ম সমর্পণ করিও"** দুইটি বিভিন্ন লীলা—বিভিন্নতত্ত্ব বিভিন্ন মাধুরী। দুইটি তত্ত্ব সর্ব্বাংশে এক হইলে—

"এসব না মানে যেই করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণকৃপা নাই তার নাই তার গতি ॥"
"হেন কৃপাময় চৈতন্য না মানে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও অসুরে গণন ॥"
"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণ পদে প্রেমধন ॥
"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া ॥
"হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথাতথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কাকথা

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
"চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈলে প্রেমদেন বহে অশ্রুধার॥"

দুইটী লীলামাধুরী সর্ব্বপ্রকারে একই হইলে এই সকল মহাজন বাক্যের কিছু তাৎপর্য্য থাকে কি? শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু একদিন, শ্রীমুখে বলিয়াছেন, "অনাদির আদি গোবিন্দ স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ।" দুইটি এক হইলে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকে কি? তাহাই যদি হইল তবে এখন জিজ্ঞাস্য এই যে; আপনার শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকে যদি দুইভাগ করি, তবে কি পাই? রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ, আর মহাভাবময়ী শ্রীরাধা। এ সত্য পরমসত্য সর্ব্বসারসত্য, কোন্ মূঢ় ইহা না মানিবে? কিন্তু আলোচ্য বিষয় এই যে, অই দু'টিকে পাইলে পরে আপনার শ্রীগৌরাঙ্গ কোথায় থাকেন? তিনি কি ঐ দুই ভাগ হইয়া শূন্য মাত্র অবশেষ থাকেন, নাকি পৃথক্‌ভাবে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়? যদি শূন্য মাত্র অবশেষ থাকেন তবে তেমন গৌরত্ব-বিহীন গৌরকে ভজিয়া প্রয়োজন কি? প্রাণ ভরিয়া রাধা-গোবিন্দই ডাকিব। আর যদি তেমন মোহনমূর্ত্তিটি দাদা নিতাইকে লইয়া অক্ষুণ্ণই থাকেন, তবে আমি যদি পুনরায় কৌতুক করিয়া তাঁহাকে দুই ভাগ করিয়া দেখি, তবে কি তিনি

অসন্তুষ্ট হইবেন ? এই ভাবে অনন্ত যুগ ধরিয়া অনন্ত কোটিভক্ত যদি তাহাকে দুইভাগ করিয়া দেখেন, তবে কি তাহারা অনন্ত কোটি রাধাকৃষ্ণ পাইবেন না ? আপনি যদি আপনার শ্রীগৌরসুন্দরের রাতুল চরণদু'টি আকৃড়ে ধ'রে বসেই থাকেন, তবে আপনার তাহাতে কোন লোকসান হইবে কি ? আর আপনার প্রাণের দেবতা শ্রীগৌরনিত্যানন্দের অনন্ত দিকে সেই অনন্ত রাধাকৃষ্ণ যদি অনন্ত কাল ধরিয়া নাচিতে থাকেন, তাহাতে আপনার নিরানন্দের কোন কারণ আছে কি ? এখন আমি যদি ঐ দৃশ্য দেখিয়া আপনার শ্রীগৌরকে পরমপুরুষ বলিয়া অনন্ত কৃষ্ণকে 'উদ্ধারণ-প্রকৃতি' বলি তবে কোন সিদ্ধান্তহানি হইবে কি ?

এবার আর একটু এগিয়ে শুনুন। ভয় নাই, একেবারেই কোন যুক্তি না দিয়া কলমের জোরে প্রভু জগদ্বন্ধুর পরমপুরুষত্ব স্থাপন করিয়া আপনাকে স্বীকার করিতে বলিবনা—আর বলিলেই বা আপনি শুনিবেন কেন, আর তাহা শোনা উচিতও মনে করিনা।

আপনার ভজনীয় শ্রীশ্রীনিতাইগৌর। নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীনিতাইগৌর। কারণ, নিতাই ছাড়িয়া গৌর ভজিলে গৌর ভজন হইবে না। ধ্রুবতারা লক্ষ্য ছাড়া হইলে পথ হারা হইতে হইবে। শ্রীবৈষ্ণব সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রজলীলায় শ্রীরাধা

সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের তিনটি বাঞ্ছা অপূ । তাহা পূর্ণ করিতে দুই একাঙ্গ হইয়া আসিলেন।

"তিনবাঞ্ছা অভিলাষী
শচীগর্ভে পরকাশি
সঙ্গে সব পারিষদগণ॥"

একটু পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, 'গৌরত্ব' একটি স্বতন্ত্র বস্তু, তাহা রাধাকৃষ্ণ-মিলিতাঙ্গত্ব মাত্র নহে। তাহা হইলে শ্রীগৌড়মণ্ডলে দয়াল নিত্যানন্দ দ্বারে যে প্রেমের আমদানী হইয়াছিল ও যাহা গৌরানুগত ভক্তগণের জীবনাধায়ক, তাহা রাধাকৃষ্ণ যুগলপ্রেমমাত্র নহে—'গৌর প্রেম' নামক একটি অভিনব বস্তু। সম্বন্ধ মাত্রেরই অনুযোগী ও প্রতিযোগী থাকিবে। 'গৌরপ্রেম' যখন একটি নূতন বস্তু আমরা পাইলাম, তখন তাহার বিষয় ও আশ্রয় আমাদিগকে জানিতে হইবে। বিষয় আর আশ্রয় না বুঝিয়া কোন প্রেমরস বুঝিতে চেষ্টা পাওয়া, ভগবান না বুঝিয়া ভাগবত জানার মত হাসির কথা মাত্র। গৌর প্রেমের বিষয় 'গৌর' ইহা ত সহজ বোধ্য। আর তার আশ্রয় গৌর ভক্তগণ ইহা বোঝা আপাততঃ সরল হইলেও কিঞ্চিৎ কাঠিন্য আছে। ঐ আশ্রয়ের মধ্যে একজনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অন্যান্য সকলকে তাহার কায়ূব্যূহ স্বীকার না করিলে রসের পরিপুষ্টি সমাধান-যোগ্য হয়না। অনন্তকোটী ভক্ত, সকলেরই 'গৌরপ্রাণ

গৌরধ্যান গৌর সে জীবন' তন্মধ্যে কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা আমরা কিরূপে জানিব? কথায় বলে, 'যার কথা সেই জানে, অন্যে বলে অনুমানে।' অতএব আমাদিগের পক্ষে অনুমান করা ছাড়া উপায় নাই। অথবা একটি উপায় আছে। শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের স্বকীয় কোন গ্রন্থ যদি আমরা পাই তবে তাহা হইতে আমরা ঐ আশ্রয়-তত্ত্ব প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারিব। এখন দেখা যাক্ স্বয়ং তিনি কোনও গ্রন্থের বক্তা আছেন কিনা এই যে—

"মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাসমুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥"

রসিক-চক্রবর্ত্তি শ্রীলকৃষ্ণদাস যে স্বকীয় শ্রীগ্রন্থে "বক্তা-শ্রীচৈতন্য" এই পদটি ব্যবহার করিয়াছেন—ইহার মধ্যে একটি গূঢ় রহস্য আছে, এ পর্য্যন্ত যত বৈষ্ণবগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সকলই ভক্তগণকর্ত্তৃক ; কাজেই সকলগ্রন্থেই বিষয়তত্ত্ব শ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য ভাগবত সম্বন্ধে তাহা নহে এই গ্রন্থে যিনি প্রেমের বিষয়, তিনি তাহার বক্তা কাজেই এই শ্রীগ্রন্থে আশ্রয়তত্ত্বই বিশেষরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। অতএব শ্রীগৌর পরিকর বৃন্দের মধ্যে কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা জানিবার উপায় **একমাত্র শ্রীচৈতন্য ভাগবত**। যাঁহারা এই শ্রীগ্রন্থ আস্বাদন করিয়াছেন—তাঁহারা ধন্য। যাঁহারা এখনও করেন

নাই, আজ হইতে করুন, মধুপানে মত্ত হইবেন। এখানে আমি নিজকে পবিত্র করিবার জন্য গুটিকতক পয়ার উদ্ধার করিব।

"দেখরে নয়ন ভরি নিতাই সুন্দর।
গৌরাঙ্গ-প্রণয়-রসময় পুরন্দর॥
"একে সে নিতাই রূপ তাহে গৌর-প্রেম।
রূপের ছটায় যেন চুয়ায়েছে হেম॥"
"একে সে উত্তম দাতা তাহা গৌর আজ্ঞা পাঞা।
প্রেমের ভাণ্ডার খুলি জগতে বিলায়॥"
"গোরা প্রেমে গঠিত নিতাই কলেবর।
গোরা-রস কমলের মত্ত মধুকর॥"
"জয় জয় আদিদেব নিত্যানন্দ রায়॥"
"রাঢ় দেশ ইন্দ্র জয় নিত্যানন্দ রায়॥"
"গৌড় দেশ ইন্দ্র জয় নিত্যানন্দ রায়॥"
"আমার নিতাই সর্ব্বস্ব যার,
সে আমার আমি তার,
দু'টি বাহু তুলি বলে গৌরহরি রে আমার॥"

শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে শ্রীমুখ বাক্য—

"একবার নিত্যানন্দ বলে জন্ম ধরি।
সে জন পবিত্র হয় সে হয় আমারি॥"
"শুদ্ধ শ্বেতবর্ণ সেই বলাই অনন্ত।
এবে রসে রাঙ্গা হ'ল বুঝিয়া নিতান্ত॥

লোচন বলে আরে ভাই করি নিবেদন।
চল সবে ধরি গিয়ে নিতাই চরণ॥"

এতাবতা আমরা বুঝিলাম, গৌড়মণ্ডলের যে অভিনব বস্তু "গৌর প্রেম" শ্রীগৌরহরি তাহার বিষয় আর শ্রীনিত্যানন্দ তাহার আশ্রয়। তাহাই যদি হইল, তবে যে কারণে শ্রীকৃষ্ণকে কহিতে হইয়াছিল,—

"বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটী গুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়।"

যে কারণে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বমাধুর্য্য দেখিয়া বিচার করিতেছেন—

"এই এক শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার॥
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥"

যে কারণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মনে মনে ঐ সাধ মিটাইবার জন্য ভাবিতেছেন—

"মোরে আস্বাদিয়া রাধার যে সুখ তাহা লাগি মন ধায়।
রাই কানু দোঁহে, এক তনু করি, আবার নামিব ধরায়॥"

ঠিক সেই সেই কারণে গৌড়মণ্ডলে গৌর হরির তিনটি বাঞ্ছা অপূর্ণ, ও তাহা পূরণের জন্য নিতাই সহ তাঁহার মহামিলন স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ এই যে, প্রেমের বিষয় আর আশ্রয় যাবৎ দুইটি থাকিবে তাবৎ ঐ বাঞ্ছাত্রয় থাকিবে—থাকিবেই থাকিবে। হউন না "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" তথাপি ঐ তিন বাঞ্ছার বেলা তিনি অপূর্ণ। হউন বা পূর্ণতর বিগ্রহ শ্রীগৌরহরি রাইকানু একতনু তথাপি শ্রীনিতাই চাঁদ সম্বন্ধে ঐ তিন বাঞ্ছায় তিনি অপূর্ণ। কারণ যাবৎ দুইটি তাবৎ অপূর্ণ—যাবৎ অপূর্ণ তাবৎ দুইটি। আশ্রয় ও বিষয়ের শেষ মিলন সর্ব্বশেষ মহামহামিলন স্বীকার না করিলে আমরা পূর্ণতম বিগ্রহ পাইব না। ঐ যে "মোর গোপ্য নিত্যানন্দ", "তোমারে আমি নিজগোপ্য কহি" ঐ সকল ইঙ্গিত ঐ তত্ত্বকেই পরিব্যক্ত করে। আপনি ঐ পূর্ণ পূর্ণতম নব বিগ্রহকে "হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু" বলুন না বলুন সে আলাদা কথা, তবে সেই সর্ব্ব-তত্ত্বমিলিতাঙ্গ নবীন বিগ্রহ হইতে যে অনন্ত কোটি নিতাই গৌরাঙ্গ বাহির হইয়া অনন্তকাল ধরিয়া তাহাকে পরিক্রমণ করিতে পারেন তাহা স্বীকার করিতেই

হইবে। তাহা হইলে সেই অপূর্ব্ব বিগ্রহকে সকলের কেন্দ্র ও একমাত্র পুরুষোত্তমও অঙ্গীকার করিতে হইবে। কেহ তাহাকে "প্রভু জগদ্বন্ধু" বলিয়া জানিয়াছেন, তাই অবিরাম "হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ" গাহিতেছেন, আর গোরা না বলিয়া বলিয়াছেন "গোরী", আপনি তাহা জানেন নাই তাই স্বীয় অজ্ঞতা হেতুক ভাগ্যকে নিন্দা করিতে পারেন, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করিবার অধিকার আছে কি ?

যাহা হউক, সে অধিকার থাকুক আর না থাকুক দ্বিতীয় অমৃত বৃষ্টির কথা শুনিতে বাধা কি ? তবে আপনি যখন এতদূর পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া আমার সঙ্গে অগ্রসর হইতেছেন, আপনার উপস্থিত আর একটি আশঙ্কা নিরাকরণ করিয়াই উভয়ে দ্বিতীয়ামৃত বৃষ্টি আস্বাদন করিব। এখন একটা কথা হইতে পারে এই যে, প্রেম থাকিলেই যদি তার আশ্রয় ও বিষয় থাকে—আর বিষয় ও আশ্রয় থাকিলেই যদি অপূর্ণতা আসে এবং তাহার পূরণার্থ পুনর্মিলনের প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে এই প্রভু জগদ্বন্ধুও তো বন্ধুনিষ্ঠ বান্ধব মণ্ডলীর প্রেমের বিষয়। বিষয় থাকিলে আশ্রয় অবশ্যই আছে ; দুই থাকিলেই অপূর্ণতা থাকিল ; আর অপূর্ণতা থাকিলেই পুনরায় আর একটী বিগ্রহ স্বীকার করিতে হইবে। সেখানেও ঐরূপ হইবে ও চিরকাল ধরিয়া অনবস্থা রহিবে। এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে মাদৃশ বাচালের পক্ষে অনেক বাগাড়ম্বর করা

ছাড়া উপায় নাই। তাই শ্রীশ্রীপ্রভু নিজে এ সম্বন্ধে কি জানাইয়াছেন, অল্প কথায় তাহাই বলিয়া উপসংহার করিব।

"আমি একক সর্ব্ব সমষ্টি" "কেহ যেন আমার জন্য নিতাই অদ্বৈত না সাজে, এবার আমার একাধারেই সব।" "দুই লীলার সর্ব্ব সমষ্টি শক্তিসম্পন্ন যিনি তিনিই শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু, আমি সেইরে সেই"। "The Lila combination of all things."

পাঠক মহাশয়, এস্থলে all things অর্থে আশ্রয় ও বিষয় বুঝিয়া লউন। তবে আর গোলমাল থাকিবে না। অনবস্থার ভয় থাকিবে না। তবে কি শ্রীবন্ধুপ্রেমের কেহ আশ্রয় নাই?—তবে সে কেমন প্রেম? আছে, নিশ্চয়ই, এই যে মহাবাণী;—

"আমি হরিনামের, এভিন্ন আর কা'রো নই" "তোমরা হরিনাম ক'রে আমাকে তোমাদের সঙ্গে মিশিয়ে লও"

"হরিনাম"—আশ্রয়। আর **"প্রভু জগদ্বন্ধু"** বিষয় তাহাই "হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু।" আসুন এখন জয় জগদ্বন্ধু বলিয়া দ্বিতীয়ামৃত বৃষ্টির কথা শুনি,—

প্রথমতঃ বংশীসহ নন্দেরবালা প্রকাশ হইলেন তারপর শ্রীললিতা পদ্মিনী। শ্রী=বৃন্দা। শ্রিধাতুর অর্থ সেবা করা,ক্বিপ্ প্রত্যয়টী কর্ত্তৃবাচ্যে স্বীকার করিলে যিনি প্রকৃষ্ট সেবা করেন

তিনিই শ্রী। দূতীরূপে যিনি রাধাকৃষ্ণের মিলন সুখ সম্ভোগ প্রধানতঃ সংঘটন করেন তিনি শ্রী—বৃন্দাই সেই শ্রীপদবাচ্য। অথবা কর্ম্মবাচ্যেই ক্বিপ্। যিনি সেবিত হয়েন। রাধা-বিরহ কাতর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ বিরহ-কাতরা শ্রীরাধা পরস্পর মিলন প্রত্যাশায় যাঁহার সেবা করেন, যাঁহার সন্তুষ্টি বিধান করেন—তিনি শ্রীবৃন্দা, দৌত্যকার্য্যে বৃন্দা বড় সুচতুরা ঠিক বীরের মত কার্য্যকুশলা—তাই বৃন্দার আর একটী নাম বীরা। তথাহি শ্রীহরি কথায় ঃ—

"রাই কিলো পাব পরাণ জুড়াব
দয়া কর রে রে বীরা।
রাই চাঁদ মোর, মুইলো চকোর
প্রাণেশ্বরী কি অধীরা॥

"দূতী আগে ক্ষমা মাগে দারুণ হতাশ
রাই ভিক্ষা কৃষ্ণ রক্ষা লহ প্যারীপাশ॥
পীতবাস গলে হাস বৃন্দা ভরে বাসে।
প্রবল মানসানল পদতলে আসে॥
(পদ ধরিতে চায়রে) (বিদগধ ভুল হল)।

"ঢুকরে আদরে দূতী প্রবোধে সখায়।
এখনি মিলাব ধনী মাধবী ছায়ায়॥
(হ্যাদে এস এস গো) (এখনি দেখাব রাই)

পদ্মিনী শ্রীরাধা। পদ্মিনী অর্থ সর্ব্বপ্রকার সুলক্ষণা রমণী।

ভবতি কমলনেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্র রন্ধ্রা।
কিশলয় করযুগা দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী॥
মৃদুবচন সুশীলা নৃত্যগীতানুরক্তা।
সকল তনু সুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা॥

ইহার প্রত্যেকটি লক্ষণ শ্রীমতিতে বিরাজমান। অতএব পদ্মিনীপদে শ্রীমতিই বিবক্ষিত। অথবা সর্ব্বাঙ্গে পদ্ম যার তিনি পদ্মিনী বা পদ্মাবতী—তথা শ্রীশ্রীপ্রভুর শ্রীপদ

"কত ফুল ফোটেরে, রাইধনের প্রতি অঙ্গ!
কলিকা কোরক রঙ্গ কুমুদ কমল সঙ্গ॥"

অন্যত্র—নাভিপদ্ম, মুখপদ্ম, আখিপদ্ম তার
(একি পদ্ম বনগো) (এক রাই পদ্মে এতপদ্ম)।

অথবা তিনি সতত প্রেম পদ্মবনে শ্রীকৃষ্ণসহ বিহার করেন এইজন্য তিনি পদ্মিনী।

অতএব শ্রীললিতা পদ্মিনী অর্থ শ্রীরাধা বীরা ও ললিতা। বীরা ও ললিতা শ্রীরাধার এই দুইটী মূর্ত্তি।

বৃন্দার সঙ্গে ললিতা মিলিয়া গেলে বুঝিবা দ্বিতীয়া রাধা হইয়া থাকেন। ললিতা শ্রীরাধার অন্তর্নিহিত মহাভাবের মূর্ত্তি। শ্রীরাধা শান্তাদি পঞ্চভাবে প্রতিনিয়ত প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। শ্রীললিতা সেই পঞ্চভাবের প্রকট প্রতিমা। যথা শ্রীত্রিকালে—

"ললিতা সুন্দরীর পঞ্চভাব অর্থাৎ শান্ত দাস্য বাৎসল্য সখ্য মধুর ॥"

শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু রাধা হইতে ললিতার বিকাশ দেখাইয়াছেন আবার ললিতা হইতেও শ্রীরাধার প্রকাশের ইঙ্গিত করিয়াছেন। যথা শ্রীত্রিকালে "ত্রিকালের প্রথম ললিতা সুন্দরীর বিগ্রহ" ললিতা যেন শ্রীরাধার অন্তরের মধ্যস্থিত একটী অভিনব ভাবের পুত্তলী। প্রস্ফুটিত ঐ পুষ্পটী যেমন প্রথমে কুঁড়িরূপে ছিল শ্রীরাধাও যেমন তেমনি আগে ললিতারূপেই ছিলেন এইজন্যই ললিতাকে প্রথম বিগ্রহ কহিয়াছেন। শ্যাম নাগরকে কুঞ্জে পাইলে তাহাকে বুকে তুলিয়া লইতে শ্রীমতী যেন ললিতা হইয়া যান। আর প্রাণবঁধূ দূরে গমন করিলে শ্রীমতি পাগলিনীপারা হইয়া তাহাকে নিভৃত কুঞ্জে আনিবার জন্য ছুটিতে আরম্ভ করেন—ছুটিতে ছুটিতে শ্রীমতি বৃন্দা হইয়া যান। বৃন্দাবনে আনিতে হইলে বৃন্দা, ললিত মাধবকে সেবা করিতে হইলে ললিতা—দুই মিলিয়া পদ্মিনী শ্রীরাধা। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে। এবার দক্ষিণ পার্শ্ব দর্শন করিব।

"উদ্ধারণে শৈব্যা বিগ্রহ কমন।
জড়িত রাধা মহাভাব দামিনী ॥

সুমধুর কবিত্ব, গভীর দার্শনিক তত্ত্ব ও লীলারস এ তিনের অপূর্ব্ব সম্মিলনে এই পয়ার সমূহ বিরচিত। বান্ধবগণ ধৈর্য্য-হারা হইবেন না। আমি মূঢ় জীব, কৃপাশক্তি অনুযায়ী

সাধ্যমত পরিবেশন করিব। ভাষায় সবটুকু ফুটাইতে পারিব না! ভক্তগণ ভাবটী ধরিয়াই তৃপ্ত থাকিবেন এই প্রার্থনা।

কমন=কম্ ধাতুর অর্থ বাঞ্ছা করা। কর্ত্তৃবাচ্যে বা কর্ম্ম বাচ্যে অপ্ প্রত্যয় করিয়া পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। যিনি বাঞ্ছা করেন—পরম বাঞ্ছিত বস্তুকে যিনি সতত বাঞ্ছা করেন তিনি কমন বিগ্রহ। তিনি শ্রীচন্দ্রাবলী। অগণিত ব্রজবালা। কেহই শ্রীকৃষ্ণকে কামনা করেনা—সকলেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ কামনা করেন।

রাধাসহ ক্রীড়া রস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ-প্রাণধন।
তাহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ॥

কিন্তু চন্দ্রাবলী তাদৃশ নহেন। তিনি নিজেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করেন। তিনি শ্রীরাধার অনুগতা নহেন। তিনি যুথেশ্বরী। শৈব্যা, ভদ্রা, লক্ষ্মী তাহার গণ। তিনি দ্বিতীয়া শ্রীরাধার তুল্যা। তথাহি শ্রীউজ্জ্বল নীলমণৌ কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণে—৩৩ শ্লোক।

রাধাচন্দ্রাবলী মুখ্যাঃ প্রোক্তা নিত্যা প্রিয়া ব্রজে।
কৃষ্ণবন্নিত্যসৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্যা দিগুণাশ্রয়ঃ॥

উভয়ের সৌন্দর্য্য ও বৈদগ্ধ্যাদি গুণ ঠিক শ্রীকৃষ্ণেরই অনুরূপ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আপন রসমাধুর্য্য আপনি আস্বাদন করিতে চাহেন। ভক্তগণ মনে রাখিবেন নিত্য-লীলাতত্ত্ব বর্ণিত হইতেছে, নিত্যলোকে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলার বিকাশ দেখান হইতেছে। শ্রীহরিপুরুষের মহামহাভাব হইতে শ্রীশ্রীনিতাইগৌর প্রকাশিত হইয়াছেন। এবার শ্রীগৌরের মহাভাব হইতে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, ললিতা, বৃন্দা ও কুন্দ প্রকাশিত হইলেন। এইজন্যই "**শ্রীরাধাকৃষ্ণ সহোদর সহোদরা**", একই গৌর মহাভাবরূপ উদর হইতে দুটী প্রকাশ হইয়াছেন। মহাভাব হইতে আগে মহাভাব, পরে তাহা হইতে রসময় প্রকাশিত হইয়া থাকেন এইজন্যই নিতাই গৌরাগ্রজ, এইজন্যই "**জ্যেষ্ঠা রাধা কনিষ্ঠ কৃষ্ণ।**" প্রভুর মনে বড় সাধ স্বীয় রসসমুদ্র স্বয়ং আস্বাদন করিবেন, তাই পঞ্চরূপে প্রকাশ হইলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ গৌরগতপ্রাণ। প্রাণগোরা ছাড়া তিনি আর কিছুই জানেন না। নিত্যকাল গোরাচাঁদের আনন্দ-বিধান করিতেই নিত্যানন্দ আপনাহারা। তথাহি—

"বিনামূলে বিকাইব ভজ গোরারায় রে।"
"মধুর মৃণালভুজ নিতাই ফিরায়॥"
(গৌরপ্রেম ভরে রে)

নিত্যানন্দ পতিত পাবন
যুগের দুর্লভধন করে বিতরণ

(ঘরে ঘরে প্রেম যাচেরে)

(সকলে করে নিস্তার) (ঐ প্রভু নিতাই)

আজ প্রাণগোরা স্বীয় রসমাধুরী আস্বাদন করিতে রাধা-শ্যামরূপে তন্ময় হইতেছেন দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দও লীলার পরিপুষ্টি বিধান করিতে যত্নবান হইলেন। গোপীগণ পরিবৃত হইয়া আজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মধুর রসসম্ভোগ করিতেছেন। এই সম্ভোগ বিষয়ে সখীগণই প্রধান সহায়ক। সখীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহ স্বরূপ, শ্রীরাধার অঙ্গ হইতেই তাঁহাদের প্রকাশ হইয়াছে। সখীগণের সহায়তা চারিপ্রকারে নিষ্পন্ন হয়।

আসাং চতুর্ব্বিধো ভেদঃ সর্ব্বাসাং ব্রজসুভ্রুবাং।
স্যাৎ স্বপক্ষ সুহৃৎপক্ষ তটস্থ প্রতিপক্ষকঃ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখবিধানার্থ সখীগণ এই চারিভাবে অবস্থান করেন। কেহ সুহৃৎপক্ষ, কেহ স্বপক্ষ, কেহ তটস্থ, কেহবা বিপক্ষ। এতন্মধ্যে স্বপক্ষ ও বিপক্ষই রসের প্রকৃষ্ট পরিপোষক

"দ্বৌ স্বপক্ষবিপক্ষৌ চ ভেদাবেব রসপ্রদৌ।" ললিতা, বিশাখা, বৃন্দা কুন্দ, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী, সুদেবী সকলে প্রকাশিত হইলেন। কেহ সুহৃৎ, কেহ স্বপক্ষ সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানার্থ নানা বৈচিত্র্য উৎপাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিপক্ষ সাজিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। শ্রীনিত্যানন্দ দেখিলেন বিপক্ষ না থাকিলে রসপুষ্টি হয়না, প্রাণগোরার রসাস্বাদন পূর্ণরূপে হয়না। তাই স্বীয় মহাভাব হইতে "শৈব্যা চন্দ্রাবলী

লক্ষ্মী মঞ্জু সরস্বতী" এই পঞ্চগোপীরূপ প্রকাশিত করিলেন। শ্রীচন্দ্রাবলী ও তাঁহার এইগণ না থাকিলে খণ্ডিতা মান, বিপ্রলব্ধা, ছদ্ম, ঈর্ষা, চাপল, অসূয়া, মৎসর, অমর্ষ, গর্ব্ব, ইত্যাদি ভাবসকল শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদনীয় হইত না। বলিতে কি যে লীলায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরসসাগর উচ্ছ্বলিত—সেই দশমদশাও চন্দ্রা না থাকিলে উদ্‌যাপিত হইতনা। শ্যামচাঁদের বামদিকে শ্রীললিতা ও পদ্মিনী রাধা, দক্ষিণদিকে শ্রীশৈব্যা ও কমন বিগ্রহ চন্দ্রাবলী। এই রূপটী ভাবিলে সমগ্র ব্রজরসটী আস্বাদনীয় হইবে। এই চিত্রটী লক্ষ্য করিয়াই শ্রীশ্রীত্রিকাল-গ্রন্থে শ্রীশ্রীপ্রভু সূত্র লিখিয়াছেন,—

নামের প্রথম নাম শ্রীললিতা নাম,
নামের শেষ নাম শ্রীশৈব্যা নাম,
নামের মধ্যনাম কৃষ্ণনাম।"

শ্রীরাধার গণ যাঁহারা তাঁহারা জানেন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাতেই অধিক অনুরক্ত। শ্রীচন্দ্রার গণ যাঁহারা তাঁহারা জানেন শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকেই বেশী ভালবাসেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচন্দ্রাকে বামে লইয়া একটী কুঞ্জ মাঝারে উপবিষ্ট আছেন, সমীপে পদ্মা শৈব্যা প্রভৃতি চন্দ্রার সখীবৃন্দ ঘিরিয়া রহিয়া উভয়ের বদনমধু আস্বাদন করিতেছেন, এমন সময় শ্রীবৃন্দাসহ শ্রীললিতা আসিলেন। ললিতাকে দেখিয়া পদ্মা ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন,—

"সহি ললিদে অচ্চরিয়ং অচ্চরিয়ং
তুমং কৃখু অনুরাহ ভনিজ্জসি তা কীস
অজ্জ রাহাএ উঅদয়ং বিনা উদিদাসি ॥"

সখি ললিতে, এ বড় আশ্চর্য্য, লোকে তোমাকে অনুরাধা বলিয়া থাকে, তবে আজ কেন রাধার উদয় না হইতেই তুমি উদিতা হইয়াছ? অর্থাৎ এই দেখ প্রাণকৃষ্ণ তোমাদের রাধার সঙ্গে মিলিত না হইয়া চন্দ্রার সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন—তুমি এখানে আসিলে কেন?

শ্রীললিতা পরমা বিদুষী, তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—

রোলম্বী নিকুরম্বং চুম্বতি গণ্ডং পিপাসয়া যস্য।
সরতি তৃষ্ণার্ত্তঃ সরসীং স করীন্দ্রস্তং পুনর্নহি সা ॥

দেখ ভ্রমরী সকল কর্ণাঘাতে মুহুর্মুহু অনাদ্রিতা হইয়াও যে করীন্দ্রের গণ্ডে গিয়া চুম্বন করে সেই করীন্দ্র আবার তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সরসীর প্রতিধাবমান হয়, কিন্তু সরসী কখনও করীন্দ্রের নিকট আসেনা, অর্থাৎ তোমরা যেমন কৃষ্ণকর্ত্তৃক অনাদ্রিতা হইয়াও বারম্বার প্রেম প্রার্থনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিসার কর, কিন্তু তাঁহার সুখলেশ উৎপাদন করিতে পার না, প্রত্যুত উদ্বেগই বিস্তার করিয়া থাক, শ্রীরাধা তদ্রূপ নহেন। পরম-সুখাস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার নিকট অভিসার করিয়া থাকেন, ললিতার এই কথায় আপনাকে

পরাজিতা মনে করিয়া পদ্মা তখন শৈব্যাকে কহিলেন। সখি, আমার একটী প্রহেলিকার অর্থ বলত ?—

"চিত্তফল অম্মি লিহিদাকারে হই মাহবস্‌সদা"

চিত্র-ফলকে লিখিত হইয়া কে সর্ব্বদা মাধবের হস্তে বিরাজ করিতেছে ?

শৈব্যা উত্তর করিলেন,—"সখি, চন্দ্রাবলী"।

সুচতুরা ললিতা তখন বৃন্দাকে কহিলেন,—

"বৃন্দে, পিয়সহি কিমহি কখাএ লক্‌খিজ্জ্‌ই
মাহবো ভুঅনে ॥

বল দেখি ভুবন মধ্যে কাহার নামে মাধব শোভা পাইয়া থাকেন ? বৃন্দা কহিলেন,—"সখি ! রাধাভিখ্যয়া"—রাধানামে। পদ্মা এবারও জয়লাভ করিতে না পারিয়া কহিলেন ;—সখি শৈব্যা ! আর প্রহেলিকা প্রসঙ্গের প্রয়োজন নাই। এখন কমলেক্ষণ কর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ ভ্রমর কর্ত্তৃক পীতমধু চন্দ্রাকে দর্শন কর। শৈব্যা কহিলেন, সখি, বিকশিতা কুমুদিনী তাবৎ কালই ভ্রমরের আমোদ বিস্তার করিয়া থাকে যাবৎ পদ্ম শ্রেণীর প্রতি তাহার দৃষ্টিপাত না হয়। এস্থলে ভ্রমর পদ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ও পদ্ম পদে চন্দ্রাকে ও কুমুদিনী পদে রাধাকে লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ যাবৎ কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর আস্বাদন না পায়েন তাবৎ পর্য্যন্তই রাধাসহ বিহার করেন। পদ্মা কহিলেন, সখি ! সত্যই কহিয়াছ, এসম্বন্ধে প্রমাণ দেখ,—

বিজ্জোদন্তী রাহা পেক্‌খিজ্জই তাব তার আলীহিং
গঅনে তমাল সামে ন যাব চন্দ্রাঅলীপফ্‌ফুরই॥

'তমালের ন্যায় শ্যামবর্ণ গগনে তারাবলীর সহিত রাধা অর্থাৎ বিশাখা নক্ষত্র শোভা পাইয়া থাকে, চন্দ্র উদয় হইলে নক্ষত্র মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।'

এই শ্লোক শুনিয়া ললিতা হাসিয়া উঠিলেন। প্রাকৃত ছাড়িয়া একটু চেষ্টা করিয়া সংস্কৃত ভাষাতেই বলিতে লাগিলেন,

সহচরি বৃষভানু জায়াঃ
প্রাদুর্ভাবে বরত্বিষোপগতে।
চন্দ্রাবলী শতান্যপি
ভবন্তি নির্ধৃত কান্তীনি॥

"হে সহচরি! বৃষভানুজা অর্থাৎ বৃষরাশিস্থ ভানু জনিত উৎকৃষ্ট কান্তির প্রাদুর্ভাব হইলে শত শত চন্দ্রাবলীও মলিন-প্রভা হইয়া থাকে।" পথে ঘাটে উভয় পক্ষের সখীগণের দেখা সাক্ষাৎ হইলে এইরূপ রসিকতা যুক্ত বাক্যালাপ আমরা প্রায়শঃ শুনিতে পাই।

আমাদের শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাধাকে দেখিয়া যেমন সুখী চন্দ্রাকে দেখিয়াও প্রায় তেমনই সুখী বলিয়া মনে হয়। এই যে গভীর কান্তারে চন্দ্রাকে দেখিয়া কি কহিতেছেন—

"স্বয়ং মম লোচনেন্দীবর চন্দ্রিকা চন্দ্রাবলী"

প্রিয়ে! চন্দ্রস্তব মুখবিম্বং চন্দ্রা নখরাণি কুণ্ডলে চন্দ্রৌ।
নবচন্দ্রস্তু ললাটং সত্যং চন্দ্রাবলী ত্বমসি॥

তোমার মুখমণ্ডল, নখ শ্রেণী কুণ্ডলদ্বয় এবং ভাল দেশ সকলই চন্দ্রস্বরূপ অতএব যথার্থ তোমার নাম চন্দ্রাবলী।

যথার্থেয়ং বাণী তব চকিত সারঙ্গ-নয়নে
সুবর্ণালঙ্কারো মধুরয়তি যত্তে শ্রুতিযুগম্।
মুখেন্দোরন্তস্তে বহিরপি সুবর্ণ চ্যুতিরিয়ং
মমশ্রোত্র দ্বন্দ্বং নয়ন যুগলঞ্চাকুলয়তি॥

'হে চকিত মৃগনয়নে! সুবর্ণালঙ্কার তোমার কর্ণযুগকে যে মাধুর্য্যশালিন করিয়াছে একথা সত্য কেননা ত্বদীয় মুখ-চন্দ্রের অন্তর ও বাহির হইতে সুবর্ণক্ষরণ হইয়া অর্থাৎ মুখ-মধ্য হইতে সুন্দর অক্ষর ও মুখ চন্দ্রের বাহির ও গণ্ডস্থল হইতে সুষ্ঠু কান্তি প্রকাশ হইয়া আমার কর্ণযুগল ও নয়নযুগল আকুল করিতেছে।

সে যাহা হউক আমাদের পদকর্ত্তাগণ ও রসিক ভক্তগণ শ্রীরাধাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। উভয়েই অধিক প্রিয়তমা, তথাপি রাধা সর্ব্বথা অধিকা।

তয়োরপ্যুভয়ো র্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সি॥

কারণ শ্রীরাধায় শ্রীগৌরের মহাভাবের অভিব্যক্তি, আর

শ্রীচন্দ্রাবলীতে শ্রীনিত্যানন্দের মহাভাবের প্রকাশ। ভক্তগণ সকলেই শ্রীমতির স্বপক্ষ সাজিয়া ভজন করেন! কাজেই ললিতাদির যুথানুগত্য গ্রহণ করিয়া সকলেই চন্দ্রাকে সর্ব্বনাশী দূর হও, গণিকা ইত্যাদি বলিয়া কৌতুকাবহ গালিবর্ষণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ দুইই সমান। দ্বিতীয় অমৃত বৃষ্টিতে আমরা কি পাইলাম,— একদিকে শ্রীমতির যুথ, অপরদিকে শ্রীচন্দ্রার যুথ, মধ্যস্থলে শ্যামনাগর; এই দ্বিতীয় যুথটীর প্রকাশে কি ফল হইল? তাহাই বলিতেছেন **"উদ্ধারণে"**

উদ্ধারণ দ্বিতীয়ামৃত বৃষ্টির শেষ ফল। মহা উদ্ধারণ চুর্যীরস শ্রীশ্রীহরিপুরুষের আস্বাদনের বস্তু। তাহা যখন গড়াইয়া আসিয়া জীবের আস্বাদনযোগ্য হইল, তখন তাহার নাম উদ্ধারণ। এই উদ্ধারণই প্রথম সোপান। শ্রীশ্রীহরিপুরুষের শ্রীচরণ-প্রান্তে পৌছিতে উদ্ধারণই প্রথম প্রধান ও একমাত্র অবলম্বন। তাঁহাই শ্রীত্রিকাল গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন যথা—**"উদ্ধারণকে বিদ্যা কহে; মহা উদ্ধারণকে সিদ্ধি কহে**। চরম ও পরম বাঞ্ছিত-ধন মহাউদ্ধারণ রস। উদ্ধারণ সেই ফলপ্রাপ্তির শিক্ষালয় স্বরূপ। উদ্ধারণ মহাউদ্ধারণের প্রাপক। পুনশ্চ উদ্ধারণ মহাউদ্ধারণে নিহিত থাকায় উদ্ধারণ প্রাপ্যবস্তুও বটে। এই উদ্ধারণের স্বরূপ আস্বাদন করিবার পূর্ব্বে "উদ্ধারণ প্রকৃতি" "উদ্ধারণ অবতার প্রকৃতি নহেন"† এই আপাত বিরুদ্ধার্থক

† এই সূত্রটী শ্রীত্রিকাল গ্রন্থোক্ত নহে, অন্য সময়ে অন্যত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

সূত্রদ্বয়ের তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিবার প্রয়াস পাইব। পূর্ব্বে নন্দের বালার ভাষ্যপ্রসঙ্গে পুরুষপ্রকৃতি তত্ত্ব কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। চরমভোক্তৃত্বই পুরুষত্ব এই কথা সেখানে উক্ত হইয়াছে। শ্রীহরিপুরুষ সর্ব্বশেষ ভোক্তা, সর্ব্বশেষ প্রমাতা কাজেই তিনিই একমাত্র পুরুষ। আর সব প্রকৃতি, এই সিদ্ধান্ত সেখানে দেখাইয়াছি। এখন কথা হইতেছে এই যে সাংখ্য শাস্ত্রের পুরুষের মত আমাদের এই পুরুষ যদি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইতেন তবে সিদ্ধান্ত বহল থাকিত। আমাদের পুরুষ মায়ার অতীত, মায়িক সৃষ্টির সহিত তাহার লেশমাত্র সম্পর্ক নাই, তিনি প্রকৃতির পরপারে—অথচ তিনি ভোক্তা, ইহার সামঞ্জস্য কিরূপে হয়? ভোক্তা বা প্রমাতার ভোজনীয় বা প্রমেয় কিছু আছেই, আর সে ভোজনীয় বস্তু নিশ্চয়ই তাহা হইতে ভিন্ন। অথচ আমরা বলিয়াছি তাহা হইতে ভিন্ন যা কিছু সবই প্রকৃতি। অতএব সেই ভোজনীয় বস্তুর প্রকৃতিত্ব সিদ্ধ হয়। পুনশ্চ কহিয়াছি, প্রকৃতির সঙ্গে তার লেশ মাত্র সম্বন্ধ নাই অথচ ঐ আস্বাদনীয় বস্তুর সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ না থাকিলে তিনি ভোক্তা হইতে পারেন না কাজেই শ্রীহরির পুরুষত্বই সিদ্ধ হয় না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রীশ্রীপ্রভু পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়ের অবতারণা করিয়াছেন। এই সূত্রদ্বয়ের মর্ম্মার্থ এই যে প্রকৃতি দুই প্রকার। উদ্ধারণ-প্রকৃতি, আর জড় প্রকৃতি।

এই দ্বিবিধত্বের হেতু মায়ার দ্বৈবিধ্য। মায়াও দুই প্রকার যোগমায়া ও মহামায়া। 'মায়িক সৃষ্টি' কথাটী বলিলেই বুঝিতে হইবে জড় প্রকৃতির বিকারভূত মহামায়ার রাজ্য। উদ্ধারণ তাদৃশ মায়ার রাজ্যের বস্তু নহে, কাজেই উদ্ধারণ প্রকৃতি নহেন। যোগমায়ার একটি আলাদা নিত্য রাজ্য আছে। সেই রাজ্যের বস্তুজাত শ্রীহরি পুরুষের আস্বাদনীয়। তৎসমষ্টিস্বরূপ মহাউদ্ধারণ *। জীব তটস্থশক্তিবিশেষ।

---

* পৌর্ব্বাপর্য্য না বুঝিলে কোন সূত্রেরই তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। "হরিপুরুষ" এই সূত্রটির পরেই "উদ্ধারণ প্রকৃতি" সূত্রটি লিখিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীহরির "পুরুষত্ব" সিদ্ধির জন্য যে বস্তুটুকু আস্বাদনীয় স্বীকার করিতে হইবে তাহা উদ্ধারণ বা উদ্ধারণ-প্রকৃতি। আমরা পূর্ব্ব হইতে ঐ বস্তুকে মহাউদ্ধারণ কহিয়াছি। উদ্ধারণে মহাউদ্ধারণের অংশত্ব থাকায় ইহাতে কোন অসামঞ্জস্য হয়না। তবে উদ্ধারণ কেবল মহাউদ্ধারণের অংশমাত্র নহে। মহাউদ্ধারণ উপেয়, উদ্ধারণ উপায়— উপায়ত্ব নিবন্ধন লীলায় তটস্থাখ্য শক্তির সঙ্গে কিঞ্চিৎ সম্পর্কান্বিত। উদ্ধারণ মায়া অমায়ায় সন্ধিস্থলে। তুমি মায়িক জীব, মায়া কাটাইতে চাওতো "উদ্ধারণ ধর" তন্ত্রমন্ত্র যোগযাগ শেষ বেদ পর্য্যন্ত "ত্রৈগুণ্য বিষয়াঃ" অর্থাৎ মায়িক, একমাত্র উদ্ধারণ তোমাকে মায়াতীত রাজ্যের সংবাদ দিবে। ঐ কনক প্রতিমা প্যারী শ্রীকৃষ্ণের বিহনে দশমদশায় ভূমে গড়াগড়ি যাইতেছেন। তুমি তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া "হায় হায়" করিতে পারিবে কি? ইহার নামই উদ্ধারণ ধরা। চন্দ্রা আর শৈব্যা তোমাকে পথ দেখাইয়া দিবে।

মহা উদ্ধারণ রস সমুদ্রের তটে, মহামায়ার রাজ্যের গণ্ডীতে জীবশক্তি সীমাবদ্ধ, তাই মহাউদ্ধারণ রসের আস্বাদন কদাপি জীবের ভাগ্যে ঘটে না বা ঘটিত না। বংশী আলাপে জীব উন্মুখ হইত, ছুটিয়া আসিত কিন্তু মিলিতে পারিত না—তাই উদ্ধারণের অবতারণ।

যোগমায়া আর মহামায়ার সংযোগস্থলে রহিয়া উদ্ধারণ পরাপ্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতির ভেদক রেখা স্থানীয় হইয়াছেন। তাই উদ্ধারণ প্রকৃতি, আবার প্রকৃতি নহেন। পরাপ্রকৃতি শ্রীরাধা,—অপরা প্রকৃতি শ্রীচন্দ্রা—উদ্ধারণ দুইটির মিলনাত্মক। তাহাই লিখিতেছেন—

"জড়িত রাধা মহাভাব দামিনী"

অরুণোদয়ে কুঞ্জ ভঙ্গ হয়—গোধূলীতে মিলন হয়। এই প্রপঞ্চ সৃষ্টির প্রাক্কালে যে কুঞ্জভঙ্গ হইয়াছে অবসানে তার মিলন হইবে। মায়িক বস্তুমাত্রই মিলনে বাধা দেয়। মায়িক-সৃষ্টি মিলনের অন্তরায়—মায়া সম্পূর্ণরূপে তিরোভূত হইলে মিলন হয়। অতএব মায়া বিপক্ষ। চন্দ্রা মূর্ত্তিমতী বিপক্ষতা; চন্দ্রা জীব-জগতের প্রতীক।

সযুথ যুথেশ্বরী চন্দ্রা যখন রাধা মহাভাব জড়িত হইবে তখনই উদ্ধারণের প্রকাশ হইবে। স্বপক্ষ বিপক্ষের মিলন কিরূপে সম্ভব? মিলনে সে মিলন হয় না, তাই বিরহের দ্বারা সেই মিলন উদ্যাপিত হয়। ভক্তগণ, পূর্ব্বের সেই চিত্রটী মনে

করুন। একদিকে রাধা আর ললিতা, আর একদিকে শৈব্যা আর চন্দ্রা, মাঝে শ্যামসখা। আসুন আমরা অ-ক্রূর বুদ্ধি হইয়া ঐ লীলা দর্শন করিতে করিতে মাঝখান হইতে শ্যাম-ধনকে সরাইয়া লই—এখন রাধা মহাভাব দামিনীর ছটা চন্দ্রার অঙ্গে পড়িবে নাকি? মাঝে ঐ ঘনশ্যাম ছিলেন বাধা, শ্যাম জানিতেন যে তিনি প্রতিবন্ধক। তাই শ্যাম লুকাইলেন। মথুরায় গেলেন—ওকথা আমরা মানিনা, কারণ বৃন্দাবনচন্দ্র বৃন্দাবন ছাড়িয়া কস্মিন্‌কালেও যান না। চন্দ্রাকে রাধা মহাভাব জড়িত করিতে আড়ালে লুকাইলেন। ইচ্ছা শক্তিদ্বারে লীলা হয়। ইচ্ছাময় আপন ইচ্ছাশক্তিকে পৃথক্‌ করিয়া মথুরায় প্রেরণ করিলেন। তথায় ক্ষীরোদশায়ী চিন্ময় মহাবিষ্ণুর সঙ্গে সংযোগে মথুরা ও দ্বারকা লীলা হইল। ব্রজেন্দ্রনন্দন যিনি, তিনি ইচ্ছা শক্তিকে পরিহার করিয়া ব্রজে রহিলেন। ইচ্ছাশক্তির সহায়তা মুখ্যতঃ না থাকিলে লীলার প্রকাশ-স্বভাবতা থাকে না। কাজেই গোপীগণ প্রাণকান্তকে দেখিতে না পাইয়া বিরহ সিন্ধুমাঝে ডুবিতে লাগিলেন। সেই বিরহের শেষ পরিণতি দশমদশা। আজ দশমীতে মৃত্যুর কোলে শ্রীমতী। আজ বড় সুন্দর দিন। নিত্যযুগল শ্রীনিতাই-গৌর বুঝি নিত্য-মিলন ভাল না বাসিয়াই পৃথক সাজিয়াছেন। পৃথক না হইলে মিলনের সুখ কোথায়? গৌরমণ্ডলে নিত্য মিলন, তাই পৃথক্‌ হইতে ব্রজমণ্ডলে প্রকট হইয়াছেন,—শ্রীমতী

আর শ্রীচন্দ্রা। আজ শ্রীনিতাই গৌরের মিলনানন্দ উদ্‌যাপিত হইবে। চিরমিলিত তাঁহারা, সাধ করিয়া চির বিচ্ছেদের ছদ্মবেশ পরিয়াছিলেন—আজ দশমে সে মুখোস খুলিয়া গেল।

শ্রীরাধা এ পর্য্যন্ত চন্দ্রার সঙ্গে মিশেন নাই। কোনদিন ভাল করিয়া চন্দ্রার মুখখানা দেখেন নাই। একদিন গোবর্দ্ধন শিলায় নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিরহোন্মাদ অবস্থায় নিজ প্রতিবিম্বকেই "চন্দ্রা" মনে জানিয়া বলিয়াছিলেন—

"সান্দ্রৈঃ সুন্দরী বৃন্দশো
হরিপরিষ্বঙ্গৈ রিদং মঙ্গলং
দৃষ্টং হে হত রাধয়াঽঙ্গমনয়া
দিষ্ট্যাদ্য চন্দ্রাবলি।
দ্রাগেনাং নিহিতেন কণ্ঠমভিতঃ
শীর্ণেন কংসদ্বিষঃ
কর্ণোত্তংস সুগন্ধিনা নিজভুজ-
দ্বন্দ্বেন সন্ধুক্ষয়॥ ২৯ (হরিবল্লভা প্রকরণ।)

হে সুন্দরি! তুমি শ্রীহরিসহ বহুবার আলিঙ্গন করিয়াছ। তাহাতেই তোমার এই অঙ্গ মঙ্গলযুক্তা হইয়াছে! যাহা হউক, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তোমার এই অঙ্গ আমার নেত্রগোচর হইল, অতএব হে সখি তদীয় ঐ শীর্ণবাহু যাহা কংসরিপুর্ কর্ণোৎপলের সৌরভ বহন করিতেছে তাহাদ্বারা আমার কণ্ঠদেশ সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করতঃ আমাকে জীবিতা কর।

শ্রীরাধার এই আক্ষেপোক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন সময় রাধা ও চন্দ্রায় বিপক্ষতা ঘটে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিশ্লেষদশা উপস্থিত হইলেই ঐ দুইজন আবার স্নেহভাব সম্পন্ন হয়। রূপমঞ্জরী শ্রীলরূপ বলিয়াছেন—

ক্ষিপেন্মিথো বিজাতীয় ভাবয়োরেষ পক্ষয়োঃ
ঈর্ষাদীন্ সপরিবারান্ যোগে স্বপ্রেষ্ঠতুষ্টয়ে।
অতএব হি বিশ্লেষে স্নেহস্তাসাং প্রকাশতে ॥

পরমশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টি নিমিত্ত স্বীয় পরিবারবর্গ ঈর্ষাদিকে সংযোগ সময়ে পরস্পর বিজাতীয় ভাব পক্ষদ্বয়ে নিক্ষেপ করে, পরন্তু পরস্পর ঐ ভাবদিগের বিশ্লেষ দশাতে স্নেহভাব প্রকটিত করিয়া দেয় ॥

আজ মৃত্যুর কোলে শয়ন করিয়া শ্রীরাধা শৈব্যাকে কহিলেন—

"গাও হরি নাম শৈব্যা হরি নাম গাও।
হরিনাম ল'য়ে মাগো চন্দ্রা কাছে যাও ॥
(তারে নাম দিও মা) (সে বড় বৈমুখ মা)"

(শ্রীহরি কথা)

চন্দ্রাও শ্যামবিরহে জর জর তনু। তথাপি রাধা-বিদ্বেষ ঘুচে নাই। আজ শৈব্যা আসিয়া ডাকিলেন, তখন সজল নয়নে চমকিতা হইয়া দাঁড়াইলেন, তারপর আবার কি জানি

কি ভাবিয়া আর অগ্রসর হইলেন না, চিত্রার্পিতের মত স্থির হইয়া রহিলেন। বিলম্ব দেখিয়া শ্রীরাধা বৃন্দাকে পাঠাইলেন—

"বৃন্দা ডাকে চন্দ্রা আয় বন্ধু পতনে"

(শ্রীহরি কথা)

বৃন্দা গিয়া চন্দ্রার হাত দু'টি ধরিয়া শ্রীরাধার কুঞ্জে লইয়া আসিলেন। শ্রীরাধার কুঞ্জে চন্দ্রা আর কোন কালে আসেন নাই। আজ আর সে চন্দ্রা নাই, সে রাধাও নাই।

"চন্দ্রাবলী শৈব্যা লক্ষ্মী পড়ে রাধাপদে।
কেলিকিলা সরস্বতী সম্বরে জলদে।"

(শ্রীহরি কথা)

তখন শ্রীরাধা অতি ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন,

"চন্দ্রাবলী শৈব্যা তোর পুর্ণ মনস্কাম।
আমার নীল রতন তোদের দিলাম॥"

(শ্রীহরি কথা)

চন্দ্রাবলীরও নীলরতন আছে। কিন্ত সে চন্দ্রাবল্লভ। রাধাবল্লভকে চন্দ্রা চাহিত না; আজ শ্রীরাধা তাহার প্রাণ-কান্তকে চন্দ্রার করে সমর্পণ করিয়া কহিলেন,—

"তোরা কৃষ্ণ বল মা
কৃষ্ণ নাম হরি নাম॥"

(শ্রীহরি কথা)

চন্দ্রাও অবিরাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতেন, ডাকিতেন। কিন্তু ডাকিলে কি হইবে সে ডাকে মদন মোহন শ্রীকৃষ্ণ

বিনোদিনীকে লইয়া তাহার কুঞ্জে উদয় হইতে পারিতেন না তাই চোরের মত একাই আসিতেন। কারণ চন্দ্রার সংস্কার হয় নাই। চন্দ্রা অদীক্ষিতা। আজ চন্দ্রার গুরুকরণ হইল। শ্রীমতির নিকট হইতে চন্দ্রা কৃষ্ণ নাম-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। শ্রীরাধা কহিলেন—হায়রে ! এই মিলনটা যদি আর কিছুদিন আগে হইত তবে কত সুখের হইত ! আজ কিনা শেষকালে, একেবারে চরমে—

"চরমে তোদের গুরু হ'লাম এখন"

(শ্রীহরি কথা)

সে যাহা হউক গুরু দক্ষিণাটি দিও—

"(এই দক্ষিণা দাও) (সংকীর্ত্তন প্রচারণ) ॥"

(শ্রীহরি কথা)

আজ চন্দ্রা হৃদয়ভরিয়া রাধাকৃষ্ণ আঁকিয়া লইলেন, রাধার চরণ ধরিয়া রাধাশ্যামের জয় গাহিলেন। আগামীতে শৈব্যা লক্ষ্মী মঞ্জু সরস্বতীর সঙ্গে একত্র মিলিতা হইয়া প্রাণ ভরিয়া দক্ষিণা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন—ইহাকেই বলি চন্দ্রা-উদ্ধার। এই উদ্ধারণ ধারা ঢালিয়া দিতেই নিত্য-গোলোক ছাড়িয়া ধাম শ্রীবৃন্দাবনে প্রকট হইবেন—মূলে তাই "**উদ্ধারণে**" পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে।

এইবার আমরা তৃতীয়ামৃত বৃষ্টির কথা বলিব ও পর পর তিনটী ধারা বর্ষণে যে একটি অমিয়-সাগর গড়িয়া উঠিল, তাহা

কোথায় কিভাবে রহিল তাহাই জানিতে পারিব। যথা—

"তৃতীয়ামৃত বৃষ্টি ধামত্রয়।
মহানাম, অমিয়-সাগর-মেখলা ॥"

প্রত্যেক বাক্যে দুইটি অংশ থাকে, উদ্দেশ্য আর বিধেয়। যৎসম্বন্ধে উদ্দিষ্ট হইতেছে তাহা উদ্দেশ্য, যাহা বিহিত হইতেছে তাহা বিধেয়। উক্ত স্থলে "মহানাম" পদটি উদ্দেশ্য বা মুখ্য বিশেষ্য। ভক্ত শ্রীহরি অম্বরে চাঁদমণি বন্ধুকে দেখিয়াছেন, বন্ধুর অধরে মহাউদ্ধারণ-চুষী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা হইতে লাবণ্য ধারার ক্ষরণ অনুভব করিয়াছেন, দেখিয়াছেন—প্রথম ধারায় শ্রীগৌরনিতাই ও দ্বিতীয় ধারায় রাধাকৃষ্ণচন্দ্রাদি প্রকটিত হইয়া মণ্ডলাকারে সকলে মিশিয়া একটি মোহন মাধুর্য্য-সমুদ্র রচনা করিয়াছেন। এবার ঠিক কেন্দ্র স্থলে দৃষ্টি পড়িল। ভক্ত দেখিতেছেন, জ্বলন্ত অক্ষরে ;—

"হরি পুরুষ জগদ্বন্ধু মহা উদ্ধারণ।"

দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন **"মহানাম"**। তারপর সে মহানামটি কোথায় কিভাবে অবস্থিত তাহাই প্রকাশার্থ বিধেয় যোজনা করিতেছেন, "অমিয়-সাগর-মেখলা।" দশদিকে অমৃতের সাগর। কোন্ অমৃত ? যে অমৃতের ধারার কথা এতক্ষণ প্রকাশ করিলেন। প্রথমে অমৃত স্বরূপ, তারপর দুইটা বৃষ্টিতে একটা অমিয় সাগর সৃষ্টি হইয়াছে তাহা মহানামের মেখলা স্বরূপ। একটী বীজের সারাংশভূত শাঁসটি, যাহা বীজের

প্রাণশক্তি, তাহা যেমন বীজ বেষ্টিত হইয়া আপনাকে লুকাইয়া রাখে; সর্ব্বরস-সমুদ্রের বীজ স্বরূপ মহানাম, তেমনি আপনাকে রাখিয়াছে,—অগাধ অমিয়সমুদ্রের মধ্যস্থলে, তাই বলিয়াছেন অমিয়-সাগর-মেখলা। এপর্য্যন্ত মধুরসের রস তরঙ্গ যা কিছু দর্শন ও বর্ণন করিয়াছেন মহানাম তার মহাবীজস্বরূপ। মূলকথা ভক্ত একবার সংশ্লেষণ আর একবার বিশ্লেষণ করিয়া অনুভব করিতেছেন। বিশ্লেষণ করিতে করিতে ভক্ত অমিয় রসের পাথারে পড়িয়া যেন হাবডুবু খাইতেছিলেন, তাই সংশ্লেষণ করিয়া মূলানুসন্ধিৎসু হইয়া, পাইলেন—চারিটি তত্ত্বমাত্র।

"হরি" "পুরুষ" "জগদ্বন্ধু" "মহাউদ্ধারণ"

"নাম" "রূপ" "বিগ্রহ" আর "রস" চারিটিকে একত্র করিয়া বুঝিলে একটি মাধুর্য্যময় শিশু মূর্ত্তি; আর পৃথক পৃথক্ করিয়া বুঝিলে, নাম, নাম মাত্র, তাহা অম্বরসদৃশ। রূপ, রূপ-মাত্র অনাদির আদি নিত্য সুন্দর পুরুষ রূপ। ঐ পুরুষত্ব বা আস্বাদকত্ব বা ভোক্তৃত্ব একমাত্র তাহাতেই আছে। নাম আর রূপ মিলিয়া হরি-পুরুষ, যখন নাম আর রূপ অভেদ রূপে একই কালে আস্বাদন-বিষয় হয় তখনই বিগ্রহ প্রকাশ, 'প্রকাশ নাম প্রভু জগদ্বন্ধু।' তার পর রস; তাহা তুরীস্বরূপ, তাহা মহাউদ্ধারণ রস। সেই রস ধারার বর্ষণ হইতেছে প্রথম প্রকাশ "গোরাশশী' ও 'নিতাইচাঁদ'। সর্ব্বপ্রধান ও

সর্ব্বভাবের মূল প্রস্রবন বলিয়া কেবল নিতাইর নামই উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে শ্রীবাস অদ্বৈত ও গদাধরও বিবক্ষিত। শ্রীগৌরহরি হইতে পঞ্চ প্রকাশ—রাধা শ্যাম বৃন্দা কুন্দ ও ললিতা। শ্রীনিতাই হইতে পঞ্চ প্রকাশ চন্দ্রা, শৈব্যা, ল মঞ্জু, সরস্বতী। শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাসাদি হইতেও এইরূপে পঞ্চ প্রকাশ। এইরূপে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। হরিনাম রূপ অ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ রজঃরাণী বনদেবী শারীকেক পর্য্যন্ত প্রত্যেকটিই রস সমুদ্র। অনন্ত লোক পরিব্যাপ্ত এই অগাধ অমিয় সমুদ্র, কিন্তু অনুধ্যান করিলে মূলে ঐ চারিটী মহাতত্ত্ব। হরি, পুরুষ, জগদ্বন্ধু, মহাউদ্ধারণ। ঐ অনন্তানন্ত-ময়ের অনন্ত অনন্ত লীলার আদিমূল (Potentiality) ঐ চারিতত্ত্বে নিহিত। ভক্ত তাই গাহিয়াছেন,—

"হরি পুরুষ জগদ্বন্ধুর অক্ষরে অক্ষরে
কোটী কোটী কৃষ্ণ রাধা লীলা রসে ভোরা॥"

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অনন্ত লীলা ও শ্রীগৌরের অনন্ত লীলা মাধুরী এই মহানামের প্রত্যেক বর্ণে বিরাজমান। এই সকল মহা মাধুর্য্যময় তত্ত্বকথা।

এস্থলে অতি বিস্তার না করিরা সংক্ষেপে কহিতেছেন "মহানাম,—অমিয়-সাগর মেখলা"

এইবার অমিয় সাগরের আর একটি বিশেষণ যোগ হইতেছে। কেমন সাগর? ধামত্রয়যুক্ত। ধামত্রয় শব্দটি

তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন। যে সাগরে তিনটি ধাম আছে। এই ধামত্রয় কোথা হইতে কিরূপে আসিল তাহাই বলিতেছেন—'তৃতীয়ামৃতবৃষ্টি'। তৃতীয়ামৃত বৃষ্টি হইয়াছে কারণ যাহার—যে ধাম ত্রয়ের। বৃষ্টি হইতে ধামের উদ্ভব কিরূপ তাহা স্পষ্টতঃ বলেন নাই। ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। বৃষ্টির পর বৃষ্টি বলিয়া গেলেই তাহার প্রথমত্ব দ্বিতীয়ত্ব তাৎপর্য্যতঃ সিদ্ধ হইত। পুনরায় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় উল্লেখ করিবার হেতু কি? হেতু এই, যে পর পর বৃষ্টিতে উল্লাসাধিক্য বিজ্ঞাপন করা। শৈত্যাধিক্যে যেমন জল-জমিয়া বরফ হইয়া যায়—উল্লাসাধিক্যে তেমনি মহাউদ্ধারণ চুষীরস জমাট বাধিয়া তিনটি অখণ্ড সত্তায় পরিণত হইল।

এই ধামত্রয়ের তত্ত্ব পরে আস্বাদন করিব তৎপূর্ব্বে উক্ত অন্বয়স্থাপন প্রয়োজনীয়। আপাত দৃষ্টিতে 'মহানাম, অমিয় সাগর-মেখলা' কে একটি সমাসবদ্ধ শব্দ বলিয়া মনে হয়। কোন ও কোনও বান্ধব, মহানাম রূপ অমিয় সাগর, তাহাই হইয়াছে মেখলা যাহার এইরূপ অর্থ করিয়া ধাম ত্রয়কে মুখ্য বিশেষ্য বলিয়াছেন। এইরূপ ব্যাখ্যা সমীচিন নহে। এইরূপ অর্থনির্ণয়ে প্রধানতঃ দুইটি দোষ ঘটে।

১। বিশিষ্ট-জ্ঞান বিশেষণ জ্ঞান সাপেক্ষ। তুলসীকণ্ঠী ব্রহ্মচারী, মাল্যধারী পূজারী এইসব বিশিষ্ট-জ্ঞান, বাক্য দ্বয়ে

তুলসীকণ্ঠী ও পুষ্পমালা বিশেষণ, ব্রহ্মচারী ও পুজারী বিশেষ্য। পুষ্পমাল্য ও তুলসী সম্বন্ধে জ্ঞান পূর্ব্বে না থাকিলে ঐ বিশিষ্ট জ্ঞানদ্বয় উৎপন্ন হইতে পারে না! আলোচ্য পংক্তি-দ্বয়ে যদি 'ধামত্রয়' মুখ্য বিশেষ্য হয় ও 'মহানাম অমিয়সাগর মেখলা' বিশেষণ হয় তবে ধামত্রয়ের জ্ঞানের পূর্ব্বেই মহানাম সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু চাঁদমণি বন্ধু হইতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত আমরা মহানাম কি বস্তু তাহা বিন্দু মাত্রও জানি নাই—অতএব কি প্রকারে মহানামকে বিশেষণ করিয়া ধামত্রয় বিশেষ্য হইতে পারে? অবশ্য চুষি পরিচয় প্রসঙ্গে মহানামের কথা আমরা বলিয়াছি কিন্তু তাহা প্রসঙ্গতঃ ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে মূল-বর্ণনায় চন্দ্রপাতমাধুর্য্য বিন্দুতে—মহানামের কথা এ পর্য্যন্ত কিছুই বলা হয় নাই। অতএব ঐরূপ ব্যাখ্যা অসঙ্গত।

২। ধামত্রয়কে কেন্দ্র করিয়া মহানামসাগর মেখলা করিলে সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা বলা হয়, স্বয়ং শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু শ্রীচন্দ্রপাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

"হরি হরি হরি কও—
মহানাম মহানাম"

অন্যত্র লিখিয়াছেন—"আমি হরিনাম, মহানাম নামমাত্র" এই মহানামকে ধামত্রয়ের পরিখা রূপে কল্পনা করিলে মহা-বেদ স্বরূপ প্রভুবন্ধুর মহাবাণীর অমর্য্যাদা হয়। বলিতে কি,

মহানামের মহানামত্ব নষ্ট হয়। নামকে অম্বর সদৃশ কহিয়াছেন। তৎ পূর্ব্বে 'মহা' যোগ করিয়া হইল কি না ধামের মেখলা! এইরূপ অসঙ্গতি অসহনীয়, অতএব উহা কবির অভিপ্রেত নহে।

অধিকন্তু মহানাম ও অমিয়-সাগর-মেখলা একটি সমাসবদ্ধ পদ হইলে, সমাসে সন্ধির নিত্যতাবশতঃ 'মহানামামিয় সাগর মেখলা' এইরূপ হওয়াই উচিত ছিল। অতএব মহানামরূপ অমিয়-সাগর, তাহাই হইয়াছে মেখলা যার এইরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত নহে।

তবে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যখন মহানামই উদ্দিষ্ট, তখন 'মহানাম,—অমিয় সাগর মেখলা' এই বাক্যটিকে আগে বলিয়া পরে তৃতীয়ামৃত বৃষ্টি ইত্যাদি বলা উচিত ছিল; বটে, এ জিজ্ঞাসা পণ্ডিতোচিত বটে, কিন্তু ভাব রাজ্যের দ্বার রক্ষক প্রেমোন্মাদ। অনুরাগে বিনম্রশির না দেখিতে পাইলে সে দ্বাররক্ষক, পণ্ডিত মহাশয় দিগকে ঐ রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেন না। মহানাম বস্তুতত্ত্ব যদি কেবল এই পংক্তি-দ্বয়েরই উদ্দেশ্য হইত তবে পণ্ডিত মহাশয়ের বুদ্ধিমত ঐরূপ করা সঙ্গত ছিল। কিন্তু মহানাম বস্তুটি সূত্রাত্মিকা সমগ্র কবিতাটিরই মুখ্য বিশেষ্য। "মহানাম বস্তু নির্দ্দেশই" ভক্তের অভিপ্রেত। চন্দ্রপাতের মাধুর্য্যই "মহানামে", তাহার বিন্দুর আস্বাদন দিতেই ভক্ত লেখনী ধরিয়াছেন, সেই বিন্দু-

টুকু এই :—পর পর তিনটি বৃষ্টি ধারায় শ্রীশ্রীগৌরলীলা শ্রীশ্রীকৃষ্ণ লীলা—ও শ্রীশ্রীধামত্রয় প্রকাশিত হইয়াছেন—তাহারা চক্রাকারে রহিয়াছেন অর্থাৎ মধ্যস্থলে চাঁদমণিবন্ধু-ধাম, তাহা মহামাধুর্য্যময়, সেখান হইতে মাধুর্য্যামৃতধারা অনন্তানন্ত গতিতে অনন্ত দিকে প্রবাহিত, তাহাতে অনন্ত গৌরধাম গড়িয়া উঠিয়াছে আর সেখানে অনন্ত নিতাইকে লইয়া অনন্ত গৌর অনন্ত লীলা করিতেছেন। সেই গৌরাঙ্গ ধামের অনন্ত দিকে অনন্ত গোলোকধাম, সেথায় অনন্ত উদ্ধারণ বিগ্রহ সমভিব্যাহারে অনন্ত শ্রীকৃষ্ণ, মহাভাব মধুরিমা লুটিতেছেন।

বান্ধবগণ মনে রাখিবেন, লীলার দর্শক ভক্ত বন্ধুমহামণ্ডলে রহিয়া লীলা দর্শন করিতেছেন, আমি জীবাধম প্রাকৃত কীট, প্রাকৃত প্রপঞ্চে তটস্থ হইয়া তদ্ভাষ্য রচনা করিতেছি, তাই 'ধামত্রয়' থাকিলেও আমি তাহাকে অনন্তানন্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইতেছি। শ্রীশ্রীবন্ধু মহাধাম একক। সেখান হইতে অনন্তানন্তময়ের কৃপাস্নাত হইয়া, ভক্ত অনন্ত গৌর-ধামকে একই কালে দর্শন করিতেছেন। পুনশ্চ অনন্ত গোলোক ধামকেও তৎকালে দর্শন করিতেছেন। তাই তিনি 'ধামত্রয়' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একটি প্রাকৃত দৃষ্টান্ত দ্বারা ঐটি কিঞ্চিৎ বিশদ করিবার চেষ্টা করিব। একটি পদ্মের শত সংখ্যক দল—দলের পর দলের রংএর ও কোমলতার পার্থক্য

আছে। সকল দল অতিক্রম করিয়া মধ্যে আসুন, সেখানে বিন্দু বিন্দু অসংখ্য কর্ণিকা—ঐ পরাগের মধ্যবিন্দুতে ভ্রমর হইয়া আপনি ঐ পুষ্পমধু আস্বাদন করিতে করিতে যদি বলেন মধু, পরাগ, আর পাঁপড়ি এই তিন লইয়া পুষ্পের পুষ্পত্ব তবে কি কিছু ভুল বলা হইবে? আমি ভ্রমর নহি, দর্শকমাত্র, আমি বলিলাম মধু এক, অসংখ্য কর্ণিকা, অগণিত কিঞ্জল্ক লইয়া পুষ্পত্ব, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র অনৃতভাষণ হইবে কি? মূলসূত্র-লেখক ও ভাষ্যকারের অধিকারের পার্থক্য ও দর্শনের স্থানের (angle of vision) বৈষম্য বশতঃ 'ত্রয়' পদের অসংখ্যেয় অর্থ হইয়া পড়িয়াছে।

সে যাহা হউক, এখন মেখলাটি কি ভাবে হইল তাহাই বুঝিব। সেই চুবীর অফুরন্ত মাধুরী ধারা ঘনীভূত হইয়া ধামত্রয় হইলেও শেষ হয় নাই। সেই মহামণ্ডলের সর্ব্বদিকে মেখলাকারে তাহা শোভা পাইতেছে। আমরা এই পর্য্যন্ত পাইলাম। মনে রাখিবেন, এপর্য্যন্ত মুখ্য বিশেষ্যের কথা বলা হয় নাই। এ পর্য্যন্ত যত কিছু বলিলাম এই সব হইয়াছে বিশেষণ যাহার, তাহাই হইতেছে মহানাম—চাঁদমণি শ্রীবন্ধু-ধামের ঠিক কেন্দ্রবর্ত্তী। **মহানাম ;—**

"হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ"

"মহানাম নামমাত্র"।

তাহাই বলিতেছেন, অনন্ত অনন্ত ধামেশ্বর ও তত্তৎ লীলা-পরিকরবৃন্দসহ অনন্ত অনন্ত গৌর-ব্রজধাম সম্বলিত যে

মহামাধুর্য্যামৃত সমুদ্র তাহাই হইয়াছে মেখলাস্বরূপ যার, তাহাই মহানাম। বন্ধু-গতপ্রাণ ভক্তগণ মহানাম রসে ডুবিয়া মানসনেত্রে দর্শন করুন, আমার যথাসাধ্য বলিলাম। তথাপি এক কণাও স্পর্শ করিতে পারিলাম না। ভাবুন, একটি অপরূপ শিশুধাম,তার নাম **আঙ্গিনা** ; গোলোক নহে'পলকে গোলোক কোটীপ্রসবিনী' সেই ধামের মধ্যে একটি চাঁদ—সেই শিশু বন্ধু, সেই চাঁদের মধ্যে "হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ" মহানামী মহানামকে বুকে লইয়া অনন্তকাল ভোর। সেই 'আঙ্গিনা' ধামের চারিদিকে ব্যূহাকারে গৌরমণ্ডল অনন্ত অক্ষৌহিণী সংখ্যেয়। সেই সেই ধামে প্রেমের ঠাকুর নিতাইর গলাটি ধরিয়া রসবিনোদিয়া গৌরচন্দ্র। তার চারিদিকে ব্যূহা-কারে অনন্ত গোলোকধাম, সেথায় বিনোদিনীকে বুকে লইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন রাসরসে মাতোয়ারা। তার চারিদিকে অতলস্পর্শী মাধুরীসিন্ধু—মেখলাকার। সে সমুদ্রে অগণিত তরঙ্গমালা। পরস্পর আঘাতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী রোল উঠিয়াছে তাহাই

"কীর্ত্তন কল্লোল রোল মহারোল"

রোল বলিয়া আবার মহারোল শব্দটী প্রয়োগ দ্বারা ঐ ধ্বনির দ্বিবিধত্ব বিজ্ঞাপন করিতেছেন। কোথাও—

"কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম।
রাধামাধব রাধিকা নাম॥"

কোথাও—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
গুরু গৌরাঙ্গ গোরা বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণ চৈতন্য নিমাই বন্ধুবর॥"

কোথাও—"ঐ শ্যামরায়—
ত্রিভঙ্গ ঠামে দাঁড়ায়ে কদম্ব তলায় রে"—

কোথাও—"ঐ গোরা-রায়—
নিতাই সনে কীর্ত্তনে কৃষ্ণগুণ গায় মা"—

এই শব্দ তরঙ্গ অপ্রাকৃত। প্রাকৃত ভাবের পরশ এপর্য্যন্ত নাই। তাহাই বলিতেছেন—"নাইকো কটুক্তি"। কটু শব্দার্থ বিস্বাদ। সেখানে এমন কোন শব্দ নাই যাহাতে অফুরন্ত আস্বাদন নাই। ঐ কীর্ত্তন ধ্বনির প্রত্যেকটি তরঙ্গ অনন্ত-আস্বাদনযুক্ত। মধুর রসাত্মক। মধুর রসের কথা শুনিলেই সেখানে রতিকামের বাসাবাটী আছে বলিয়া মনে হয়। ভক্ত তাই বলিতেছেন কেলিকিলা আছে, কিন্তু তার তিক্ততা নাই। কেলিকিলা বা রতির দ্বিবিধ প্রকাশ—মধুর আর তিক্ত। শান্তরতি, দাস্যরতি, বাৎসল্যরতি, সখ্যরতি, কান্তরতি এই পঞ্চে মধুরিমা। এই রতি ভক্ত প্রার্থনা করেন। "ধাম কামনা বিলাস," "রুচি রতি মতি সতী" না থাকিলে ঐ অফুরন্ত মধুরিমা কি করিয়া অনুভব হইবে? আর তিক্তরতির কুৎসিত প্রকাশ এজগতের জীবকে আর

তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তিক্ত রতি অন্ধকারময়—মধুররতি উজ্জ্বল ভাস্কর।

"কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।"

রতির এই দ্বিধা ভাব লইয়াই প্রাকৃত আর অপ্রাকৃত রাজ্যের ভেদ হইতেছে—যে দেশে শুদ্ধ মধুরা রতি—তাহাই অপ্রাকৃত।

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন"

যেদেশে তিক্ত রতির প্রকাশ—সে রাজ্য প্রাকৃত। শ্রীশ্রী-প্রভুবন্ধুহরি সেই দেশের অধিবাসীদিগকে "কীট" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন ও বহুস্থলে ঐ অর্থে—ঐ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীপ্রভু স্রষ্টাকে পর্য্যন্ত 'কীট' বলিয়াছেন। ঐ কীর্ত্তনের রোল মহারোল—যে পর্য্যন্ত সেই পর্য্যন্ত প্রাকৃতত্ব নাই। তাহাই বলিতেছেন—

"নাইকো কটূক্তি তিক্ত কেলিকিলা।"

প্রভুবন্ধুর ত্রিকাল সূত্র—'স্রষ্টা কীট' স্মরণ করিয়া ঐকথা আরও বিশদ করিয়া বলিতেছেন।

"তাঁরে কীট যত স্রষ্টা সৃষ্ট শত।
কেবল ও কুহক ঐশ্বর্য্য দ্বন্দ্ব॥"

স্রষ্টা পরমাত্মা হইতে সৃষ্ট পরমাণু পর্য্যন্ত সকলেই প্রাকৃত কীটপদ বাচ্য। তাহারা ঐ সমুদ্রের ওপারে; তাহাদের কাণে ঐ কীর্ত্তন মহারোল পৌছায় না। তাহারা কুহকময়

ঐশ্বর্য্য লইয়া দ্বন্দ্ব করিতেছে। ঐশ্বর্য্যের দ্বিবিধ প্রকাশ, কুহকময় আর প্রভাময়। "কেবলও" পদ প্রয়োগদ্বারা তাহা জানাইতেছেন। ঐ সকল মায়িক বদ্ধ কীটসমূহ কেবলমাত্র অন্ধকারময় ঐশ্বর্য্যে মত্ত। অন্ধকারেই দ্বন্দ্ব হয়। অজ্ঞানান্ধতাই সর্ব্বপ্রকার বিদ্বেষের হেতু। সবাই অজ্ঞ, সবাই অন্ধ, সবাই বধির—মায়াময় জগতে কুটিল কুপথে তাহারা গমনাগমন করে। অহর্নিশি কামের কটূক্তি শ্রবণ করে। ঐ কীর্ত্তন কল্লোল তাহাদের কাণে পৌছায় না।

অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব কামাবসায়িতা এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য কুহকময়। ইহার দুই একটি লাভ করিয়া—মানুষ ভগবদ্বিমুখ হইয়া পড়ে। আর ধৈর্য্য যশঃ, শ্রী সৌভাগ্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভাময়। এই ঐশ্বর্য্যে ক্রমে দ্বন্দ্বাতীত ভাব আসে। ক্রমে ক্রমে পরম সৌভাগ্য-বলে ষষ্ঠ ঐশ্বর্য্য বৈরাগ্য লাভ হইলে জীবের বহির্ম্মুখীনতা ঘুচিয়া যায়। জীব উন্মুখ হয়। তারপর শ্রীগুরু কৃপাবলে ঐ কীর্ত্তনের রোল একটি বার শ্রবণ করিলে—সে শ্রদ্ধান্বিত হয়। তারপর—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু সঙ্গোঽথ ভজন ক্রিয়া।
ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তি স্ততোভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

শ্রদ্ধার পরে সাধুসঙ্গ, তারপর ভজন তারপর অনর্থ নিবৃত্তি হইলে নিষ্ঠা জন্মে, তারপর রুচি, তদনন্তর আসক্তি, তারপর ভাব, তারপর প্রেমের উদয় হয়। তৎপর সেই অমিয় মেখলা অতিক্রম করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাশ্রয়ে জীব গোলোকে পৌছিতে পারে।

সেথায় সখিগণের কৃপানুগ্রহ হইলে কৃষ্ণসেবার রুচি মতি হয়। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরসে ডুব দিলে শ্রীগৌরাঙ্গধামে প্রবেশ লাভ হয়। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অপার্থিব প্রেম মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইলে শ্রীবন্ধু মহামণ্ডলে প্রবেশাধিকার ঘটে। সেখানে বন্ধুচাঁদের সুস্নিগ্ধ প্রেমালোকে উদ্ভাসিত হইলে মহানামের মোহন মাধুর্য্যবিন্দু আস্বাদন ভাগ্যে ঘটে। শ্রীশ্রীচরিতামৃতকার বলিয়াছেন,—

"কোটিমুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণ ভক্ত।"

আমরা আর একটু পাঠযোজনা করিয়া বলিতে পারি—

কোটি [illegible] মধ্যে এক গৌরজন।
কোটি গৌর ভক্তে এক বন্ধুপরায়ণ॥
কোটি বান্ধবে দুর্লভ এক মহানামনিষ্ঠ।
একমাত্র মহানাম নিত্য-কাল ইষ্ট॥

সেই মহানামের বর্ণনা এই সূত্রাত্মক কবিতার মুখ্য উদ্দেশ্য—এইজন্য পূর্ব্বে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় অমৃত বৃষ্টির কথা

বিশেষণভাবে প্রকাশ করিয়া পরে কবিতার মধ্যে মহানামের কথা বলিয়াছেন। অতএব ভগ্নপ্রক্রমাদি দোষের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীশ্রীমহানামের স্বরূপ, ধাম ও মাধুর্য্য বর্ণিত হইল। এ তো গুহ্য গোলোকের পরমাতিপরম গোপনীয় বস্তু। এ মরজগতের কামনাবদ্ধ কীট জীবকুল, তাহাদের ভাগ্যে কি পরম বস্তুর আস্বাদন মিলিবেনা। কেন মিলিবেনা?—নিশ্চয়ই মিলিয়াছে—কিরূপে তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন;—

"করুণ ঈক্ষণে বন্যা সুধাঘন।
চন্দ্রপাত শীতল অমৃত চ্ছন্দ॥"

চাঁদমণিবন্ধু এতটা কাল মেঘের আড়ালে আপনা ঢাকা দিয়ে প্রেমমাধুর্য্যে ডগমগ ছিলেন। এক দুই করিয়া তিন পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল, এবার বুঝিবা মেঘ কিছু কাটিয়া গিয়াছে। তাই ভাঙ্গা মেঘের ফাঁক দিয়ে করুণার মুর্ত্তি—চাঁদমণি একটীবার ব্রহ্মাণ্ডলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন,—জীবের তাপদগ্ধ দশা দেখিয়া করুণারাশি বিগলিত হইল। প্রাকৃতজগতে ঘনসুধা রাশির ন্যায় বন্যা উঠিল। আজ নিত্যের খেলা প্রপঞ্চে প্রকট হইবে। আজ আনন্দের সীমা নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঐশ্বর্য্যবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রকাশে জগতে হয়গ্রীব, হংস কুর্ম্ম যজ্ঞ বামন নরসিংহাদি রূপে অসংখ্য অবতার হইয়া গিয়াছে।

"অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্ব নির্ধের্দ্বিজাঃ।
যথা বিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥"

"জগৃহে পৌরুষং রূপং" হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চবিংশতি শ্লোকে শ্রীলশুকদেব তাঁহাদের দিগদর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্ম, তুরীয়, বিরাট, পরমাত্মা—সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। আজ মাধুর্য্য মূর্ত্তির প্রথম প্রকাশ হইবে। শ্রীশুকদেব পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিংশতি শ্লোকের মধ্যেই অবতারের নাম উল্লেখ প্রসঙ্গে বিংশতিতম অবতার বলিয়া ঐ মাধুর্য্যময় অবতারীর নামটী করিয়া গিয়াছেন। অবশেষে কি জানি ভুল করিয়াছি ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে বলিতেছেন,

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

এই শ্রীকৃষ্ণরূপই মাধুর্য্যসিন্ধুর প্রথম প্রকাশ। দ্বাপরের শেষে সর্ব্বপ্রথমে আমরা সেই মহা-উদ্ধারণ চুযীরসের দ্বিতীয় বৃষ্টিধারায় স্নান করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ লীলায় আসিতেছেন—সর্ব্বাগ্রে ধামের প্রকাশ। নিত্য লোকে প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় প্রপঞ্চে তৃতীয়া-দ্বিতীয়-প্রথম—এই ক্রম।

অজ শাশ্বত নিত্যপুরুষবর যেমন জীবদুঃখে কাতর হইয়া মায়ামনুষ্যরূপে ধরায় আসেন শ্রীশ্রীধামও তেমনি নিত্য অপ্রাকৃত বিভু ও অনন্ত হইয়াও জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ঐ করুণ ঈক্ষণে প্রেরিত হইয়া প্রপঞ্চে প্রকাশিত হয়েন।

শ্রীগোলোকধাম ধরায় অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশ্রীবৃন্দাবন রূপে। শ্রীগৌরাঙ্গধাম প্রকাশ হইলেন শ্রীগৌড় মণ্ডলরূপে, আর শ্রীশ্রীবন্ধু মহামণ্ডল প্রকাশিত হইলেন "আঙ্গিনা" রূপে। মানুষ শ্রীহরির কাছে যাইতে পারেনা, তাই তিনি মানুষ হ'য়ে আসেন, তেমনি জীবকুল সেই নিত্যধামে যাইতে পারেনা ; ধাম তাই কৃপা করিয়া জগতে নামিয়া আসেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বহুভাবে খেলা করেন—তন্মধ্যে "সর্ব্বোত্তম নরলীলা।" কারণ "নরবপু তাঁহার স্বরূপ।" ঠিক তদ্রূপ ধামের বহুরূপ প্রকাশ হয় তন্মধ্যে প্রপঞ্চে প্রকটধামই সর্ব্বোত্তম। গোলোকের নিত্যলীলা যেমন "নরলীলার হয় অনুরূপ।" শ্রীগোলোকধামও তেমনি শ্রীবৃন্দাবনধামের 'হয় অনুরূপ।' 'অনুরূপ' পদটী উপমাদ্যোতক, নরলীলা ও নিত্যলীলা তুলনা করিয়া বলিতেছেন, নিত্যলীলা নরলীলার অনুরূপ, এস্থলে নরলীলা উপমান ও নিত্যলীলা উপমেয়। উপমান প্রসিদ্ধ, উপমেয় অপ্রসিদ্ধ। এই হেতুই নরলীলার সর্ব্বোত্তমত্ব। চন্দ্রবৎ মুখ বলিলে চন্দ্র হইতে মুখের ন্যূনতাই প্রকাশ করা হয়। তদ্রূপ নরলীলার অনুরূপ নিত্যলীলা বলিলে নরলীলার সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব প্রতিপন্ন হয়। ঠিক সেইরূপ শ্রীবৃন্দাবন ধাম। শ্রীজীব প্রথমতঃ শ্রীগোলোকের ও শ্রীবৃন্দাবন ধামের একত্ব প্রতিপাদন করিয়া পরে বৃন্দাবনকে গোলোকের প্রকাশ না

বলিয়া গোলোককেই শ্রীবৃন্দাবনের প্রকাশ বলিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছেন। যথা,—

বস্তুতঃ শ্রীভগবন্নিত্যাধিষ্ঠানত্বেন তৎশ্রীবিগ্রহবৎ উভয়ত্র প্রকাশাধিরোপাৎ সমানগুণনামরূপত্বেন আম্নাতত্বাৎ লাঘবাচ্চ একাবিধত্বমেব মন্তব্যম্।”

অর্থাৎ বস্তুতঃ পক্ষে শ্রীভগবানের নিত্য অধিষ্ঠান হেতু উভয়ত্র প্রকাশমান ধামের একবিধত্ব মনে করিতে হইবে। একই ধাম ঊর্দ্ধে পরব্যোমে ও অধোভাগে পৃথিবীতে বিদ্যমান আছেন। একই ধাম উভয় স্থানে কিরূপে বিরাজ করেন,—তাহার উত্তর এই,—শ্রীভগবদ্বিগ্রহ যেমন এক সময় বহুবিধ স্থানে প্রকাশ পায়েন, তদীয় ধাম সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। উভয়ত্র প্রকাশমান ধাম এক বলিয়া কিসে বুঝা যায়? তাহার উত্তর এই যে উভয়ত্র প্রকাশমান ধামের গুণ-নাম-স্বরূপ সমান বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এইভাবে শ্রীবৃন্দাবন ও গোলোকের একত্ব দেখাইয়া একটু পরেই বলিতেছেন,—

“ততোঽস্যৈবাপরিচ্ছিন্নস্য গোলোকাখ্য বৃন্দাবনীয় প্রকাশবিশেষস্য বৈকুণ্ঠোপর্য্যুপস্থিতিঃ মাহাত্ম্যাবলম্বেন ভজতাং স্ফুরতীতি জ্ঞেয়ম্॥”

অর্থাৎ যাঁহারা মাহাত্ম্যাবলম্বনে ভজন করেন তাঁহাদের নিকট এই অপরিচ্ছিন্ন গোলোকনামক বৃন্দাবনীয় প্রকাশ

বিশেষের বৈকুণ্ঠোপরি স্থিতি স্ফুরিত হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ কি তাহাও অন্যত্র বলিতেছেন,—

"অথ যদুক্তং শ্রীবৃন্দাবনস্যৈব প্রকাশ বিশেষো গোলোকত্বং, তত্র প্রাপঞ্চিকলোকাপ্রকটলীলাবকাশত্বেন অবভাসমান প্রকাশো গোলোক ইতি সমর্থনীয়ম্, প্রকটলীলায়াং তস্মিন্ তৎশব্দ প্রয়োগ দর্শনাৎ, ভেদাংশ শ্রবণাচ্চ। তদেবং বৃন্দাবন এব তস্য গোলোকাখ্য প্রকাশস্য দর্শনেনাভিব্যনক্তি। তৎপ্রমাণ, শ্রীভাগবত দশমস্কন্ধ অষ্টাবিংশাধ্যায় অষ্টম শ্লোক হইতে চতুর্দ্দশ শ্লোক।

বৃন্দাবনীয় লীলার স্থিতিস্থান দুই। বৃন্দাবন আর গোলোক। অর্থাৎ গোলোক বৃন্দাবনেরই প্রকাশ বিশেষ। বৃন্দাবনে প্রকাটাপ্রকট উভয় লীলারস্থিতি। আর গোলোকে কেবল অপ্রকট লীলারস্থিতি। যে লীলা প্রাপঞ্চিক জগতে অভিব্যক্ত হয় না, সে লীলার অভিব্যক্তিস্থান গোলোক। যেহেতু প্রকটলীলায় শ্রীবৃন্দাবনে গোলোক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বৃন্দাবনের প্রকাশ বিশেষ গোলোক, তজ্জন্য শ্রীবৃন্দাবনেই সেই গোলোকাখ্য প্রকাশ দৃষ্ট হইয়াছিল। তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে।

"ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্।

শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির পরস্থিত নিজলোক গোপগণকে দর্শন করাইলেন।

"অতএবোক্তং নবেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্নিতি।" তথাচ সতীদানীং শ্রীব্রজবাসিনাং কথঞ্চিজ্জাতয়া তাদৃশ্যেচ্ছয়া— তেভ্য স্তেষামেব তাদৃশং প্রকাশ বিশেষাদিকং দর্শিতমিতি গম্যতে।

শ্রীজীবের এই সকল কথার তাৎপর্য্য এই—নিত্য-গোলোক হইতে বৃন্দাবনধামেরই মাহাত্ম্য অধিক। কারণ বৃন্দাবনের মধ্যেই গোলোক আছে, গোলোকের মধ্যে বৃন্দাবন নাই। বৃন্দাবনের যে কোন স্থানে বসিয়া গোলোক দর্শন হইতে পারে। (সর্ব্বত্রৈব শ্রীবৃন্দাবনে যদ্যপি তৎপ্রকাশ-বিশেষোহসৌ গোলোকঃ দর্শয়িতুং শক্যঃ স্যাত্তথাপি ইত্যাদি) কিন্তু গোলোকে বসিয়া বৃন্দাবন দর্শন হয় না। কারণ গোলোকে অব্যক্তলীলা শ্রীবৃন্দাবনে ব্যক্ত অব্যক্ত দুই লীলাই আছে। শ্রীবৃন্দাবনের এই দুই লীলাকে আবার পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু বলিয়াছেন,—

"বৃন্দাবন তিন প্রকার,—নিত্য-বৃন্দাবন, লীলা-বৃন্দাবন, ধাম-বৃন্দাবন। নিত্য বৃন্দাবনে একমাত্র নিত্য পুরুষ কৃষ্ণ বিরাজ করেন। লীলা বৃন্দাবনে যুগলকিশোরের নিত্যলীলা হইয়া থাকে; ইহার উৎপত্তি ও বিলয় নাই। এই লীলা বৃন্দাবনই তোমাদের ভজনীয় জানিবা। নিত্য বৃন্দাবনের

কথা তোমরা প্রায়ই চিন্তায় আনিও না। কারণ ভজনের অতিরিক্ত বিষয় স্মৃতি হইতে দূর করিতে হয়। ধাম বৃন্দাবন অর্থাৎ যে স্থানে লোক বাস করে। মানসরোবর হইতে কাম্যবন পর্য্যন্ত ধাম বৃন্দাবন বলা যায়। এই স্থানের মধ্যেই নিত্য ও লীলা বৃন্দাবন আছে। কিন্তু সকলের নিকট উহা দৃশ্যমান নহে। শ্রীকৃষ্ণের দাসী ভিন্ন উহা কেহ জানিতে পারেনা।"

শ্রীশ্রীপ্রভুর উপরোক্ত বাণীর মর্ম্মার্থ এই যে নিত্য বৃন্দাবনে বা গোলোকধামে একমাত্র কৃষ্ণ অর্থাৎ সেখানে লীলা অপ্রকট বা অনভিব্যক্ত। ভজনশীল বৈষ্ণবের তাহা চিন্তনীয় নহে। এই বাক্য হইতেও গোলোক হইতে বৃন্দাবনের উৎকৃষ্টতা প্রতিপন্ন হয়। তারপর মানসরোবর হইতে কাম্যবন পর্য্যন্ত ধাম বৃন্দাবন। এই স্থানে প্রকটলীলা হইয়াছিল—তাহাই সকলে দেখিয়াছিল। এইখানে আজও নিত্যলীলা হইতেছে অনন্তযুগ ধরিয়া হইবে। তাই বলিয়াছেন, এই ধামের মধ্যেই নিত্য ও লীলা বৃন্দাবন আছে। শ্রীকৃষ্ণ-দাসী ভিন্ন কাহারও দেখিবার সৌভাগ্য হয় না।

এই জন্য ধাম বৃন্দাবনই ভক্তের চির-আকাঙ্ক্ষিত। গোলোকবাস প্রার্থনা না করিয়া ভক্ত শ্রীবৃন্দাবন বাসই প্রার্থনা করেন। জীব শিক্ষার্থ স্বয়ং প্রভু বৈষ্ণবতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন,—

"বিধি যদি গুল্মলতা করিত রে কুঞ্জবনে।
সাজিতাম ব্রজগোপীর পদরজ আভরণে॥"

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম সম্বন্ধেও ঠিক এই সিদ্ধান্ত। নিত্য নবদ্বীপ অব্যক্ত। ধাম-নবদ্বীপে ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকটলীলা হইয়াছিল—আজও সেখানে নিত্যলীলা হইতেছে, তবে,—

"কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।"

ঐ শুনুন ভক্তভাবে প্রভুর প্রার্থনা,—

"সলিল নদিয়াপুরী, সরস রসমাধুরী;
স্বর্ণ সরোরুহ মনোহর।
মরি মরি তদুপরি, বিরাজেন গৌরহরি;
বামভাগে প্রিয় গদাধর॥
নেহারি' সে রূপ রাশি সুখের সাগরে ভাসি'
দণ্ডবৎ লোটাব ভূতলে।
(যুগলে লোটাইব) (ও চির ও রহিব)"
(শ্রীহরি কথা)

এই স্থলে 'সলিল' পদটী শ্লিষ্ট। নবদ্বীপ ধামকে সরোবরের সঙ্গে তুলনা করিতেছেন। পুনশ্চ সলিলপদে "লীলাসহ বর্ত্তমান" এইরূপ ব্যাখ্যা স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্তাই করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রীনবদ্বীপধামে নিত্য ও লীলার বিদ্যমানতা জানাইয়াছেন "চির" ও "বিরাজেন" এই বর্ত্তমানকালের ক্রিয়া ব্যবহার করিয়াও ঐ তত্ত্বের ইঙ্গিত করিয়াছেন। অনন্তর "আঙ্গিনা

ধাম” তাহারও তিনটী প্রকাশ—নিত্য আঙ্গিনা বা শিশুবন্ধু মহামণ্ডল তাহা অব্যক্ত বা অপ্রকট, ভজনশীলের ধারণার অতিরিক্ত বিষয়। ধাম-শ্রীঅঙ্গনের মাহাত্ম্য তদপেক্ষা অধিকতর—কারণ তাহাতে বর্ত্তমানে শিশুবন্ধু প্রকট লীলায় প্রকাশিত আছেন—অনন্তকাল নিত্যলীলায় প্রকট থাকিবেন। এই ধামত্রয়ের মধ্যে আবার আর একটি সম্বন্ধ আছে তাহা বড়ই রহস্যময়। যাহা নিত্য-বৃন্দাবন তাহাই ধাম-নবদ্বীপ। যাহা নিত্য-নবদ্বীপ তাহাই ধাম-শ্রীঅঙ্গন।

শ্রীমদ্ভাগবত অবতারী শ্রীকৃষ্ণকে গূঢ় কপট মানুষ বলিয়াছেন অর্থাৎ যখন লীলায় আসেন তখন তিনি মানুষ হইয়া আসিলেও মানুষ নহেন। “মানুষের মধ্যে মানুষ হইয়া আসিলেও মানুষ নহেন—অপ্রাকৃত।” মানুষের সঙ্গে মিশিবার জন্য মানুষের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীধাম সম্বন্ধেও ঐ কথা। প্রাকৃত জীবকে সেবা সৌভাগ্য প্রদান করিবার জন্য ধাম অপ্রাকৃত হইয়াও প্রাকৃতভাবে জীবচক্ষে দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

যেমন মানুষ হইয়া আসিলেও মানুষ নহেন, তদ্রূপ ধাম প্রপঞ্চে দৃষ্ট হইলেও প্রাপঞ্চিক নহেন, প্রপঞ্চাতীত। কৃপার আলোকে প্রেমের নয়ন খুলিয়া দেখিলেই দেখা যায়; ধাম অপ্রাকৃত—নিত্য; তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। তবে পরিবর্ত্তন যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা আবরণ মাত্র; জীবের সঙ্গে মিলিবার

"শ্রীশ্রীআঙ্গিনাধাম"

"শ্রীবৈভব বিলাস খর্ব্ব-কারিণী, পরা-গোলোক মহিমী মরম মানসী ;

জন্য ছদ্মবেশ মাত্র। করুণাময়ের করুণ ঈক্ষণে তৃতীয়ামৃত-বৃষ্টিজাত ঘন-সুধা স্বরূপ ধামত্রয় প্রপঞ্চ জগতে প্রেমের বন্যা তুলিয়া দিতে বৃন্দাবনে, নবদ্বীপে ও আঙ্গিনায় প্রকাশ হইলেন ॥

অনন্তর তত্ত্বময়ী কবিতার উপসংহার করিতেছেন। বর্ণনার বৈচিত্র্য ও পরিপাটী মহাবিজ্ঞজনোচিত। অথবা ইহাকে বর্ণনা না বলিয়া অনুভূতি (Revelation) বলাই অধিকতর সত্য। এই দিব্য অনুভূতি পরম শুদ্ধ-হৃদয়োচিত। ভক্ত চন্দ্রপাতের কথা বর্ণনা করিতে বসিয়াছেন। পাত শব্দার্থ পতন বা অবতরণ। পত ধাতু নিষ্পন্ন 'পাত' ক্রিয়াবিশে । ক্রিয়া মাত্রেরই তিনটি অংশ, হেতু, ফল ও ব্যাপার। ক্রিয়া মাত্রই সহেতুক। প্রত্যেক ক্রিয়ারই ব্যাপার ও ফল আছে। হেতু ও ফল পূর্ব্বে ও পরে, মধ্যে ব্যাপার। তিন মিলিয়া সম্পূর্ণ ক্রিয়া। সর্ব্বাগ্রে ব্যাপার নির্দ্দেশ, তদনন্তর হেতু ও ফলের প্রকাশ এই ভাবে কোন ক্রিয়ার বর্ণনা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ ও শ্রোতার অনুভবের পক্ষে সহজ ও সুন্দর প্রণালী। 'চাঁদমণি' হইতে "বন্যাসুধাঘন' পর্য্যন্ত যে ব্যাপারটী নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই 'চন্দ্রপাত'। সেই চুবীরস বা মহাউদ্ধারণ সুষমা ক্রমে ক্রমে আপনাকে বিকাশ করিয়াছে। স্তরে স্তরে লীলাপটের আবরণ খুলিয়া গিয়াছে। লীলারস-রাজ আপনার অনন্ত মাধুর্য্যরাশি আপনা হইতে পৃথক

করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তারপর আপনাকে দেখা দিয়াছেন ইহাই 'চন্দ্রপাত'। সূত্রাকারে অতি সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। মাদৃশ জীবাধমের সাধ্যানুযায়ী তাহার কিঞ্চিন্মাত্র রসনিষ্কর্ষণের চেষ্টা পাইয়াছি। এইবার চন্দ্রপাতের ফল ও হেতু কথিত হইতেছে। যথা—

"চন্দ্রপাত শীতল অমৃত চ্ছন্দ"

"শীতল"—শীতং লাতি দদাতি ইতি শীতলম্। শৈত্যভাব প্রদান করিয়া বিশ্ব জীবকে শান্তি রস রসিত করাই চন্দ্রপাতের ফল।

এই বিশ্ব প্রপঞ্চ সর্ব্বদাই সন্তপ্ত। শ্রীশ্রীপ্রভু এই জগৎকে বলিয়াছেন, "উষ্ণ ধান্যক্ষেত্র।" ক্ষেত্রটী ধান্যেরই বটে যথাকালে কর্ষণ ও বর্ষণ হইলে সে ক্ষেত্র দাতাভোক্তা দ্রষ্টা স্রষ্টা সকলকেই ধন্য করে। কিন্তু তাহা হইতেছে না, কেন না, সে ক্ষেত্র সর্ব্বদা উষ্ণ। চন্দ্রপাত হইল, সে ক্ষেত্রকে শীতল করিতে। এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর পাত বা পতন, বিচ্যুতি জন্য। স্বপদভ্রষ্ট হইলে পতন হয়। পতনে আঘাত লাগে, আঘাতে তাপের সৃষ্টি হয়। মায়ামোহিত জীবনিচয়ের স্বরূপচ্যুতি সাহজিক। তাই মায়িক জীবের অবিরত পতন হেতু, মায়াময় এই সংসার তাপময়, অতি উষ্ণ। ইহাই জাগতিক সর্ব্ববিধ বস্তুর পতনের ইতিহাস। সেই তাপজ্বালা প্রশমিত করিয়া জগজ্জীবকে শীতল করিতে এই

'চন্দ্রপাত'। একই কালে অগণিত জীবের স্বরূপ ভ্রষ্টতা হেতুক ধরণী সন্তাপিতা হয়। তখনই শীতলতা ঢালিয়া দিতে 'চন্দ্রপাত।'

এইবার চন্দ্রপাতের হেতু কথিত হইতেছে। শ্রীশ্রীবন্ধু চন্দ্রমা এমনি করিয়া আপনাকে বিকাশ করেন কেন? তাহাই বর্ণিত হইতেছে। **"অমৃত চ্ছন্দ।"**

চন্দ অর্থ ইচ্ছা বা অভিলাষ। অ-মৃত—যাহাতে মরণ ধর্ম্ম নাই। যাহা মরণ শীল, বিধ্বংসী বা পরিণামী নহে, তাহা অমৃত। অমৃত,—নিত্য শাশ্বত সনাতন। অতএব একটী শাশ্বতী ইচ্ছাই চন্দ্রপাতের হেতু। এই ইচ্ছাটি কি? উপনিষদের ঋষিগণ বলিলেন,

'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ'
'তদৈক্ষত বহু স্যামিতি'—ছান্দোগ্য।

এক তিনি, আছেন। তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন। কেন—এমন ইচ্ছা হইল? প্রভু বলিলেন "দরশন সাধ সাধ" তিনি আপনাকে আপনি দেখিবেন এই সাধ। এই সাধই বা হঠাৎ কেন জাগিল, প্রভু বন্ধু তাহারও উত্তর দিয়াছেন যথা,—

"আমি একক, সর্ব্ব সমষ্টি"

সর্ব্বপদে আশ্রয়ালম্বন, বিষয়ালম্বন ও উদ্দীপন বিভাব। যিনি আশ্রয়, তিনিই যদি হয়েন বিষয়, আবার তাহাতেই যদি

থাকে উদ্দীপনহেতু, তবে ঐরূপ সাধ না হইবে কেন? এক না বলিয়া বলিয়াছেন 'একক'। 'ক' প্রত্যয়টি ছোট অর্থে প্রয়োগ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে 'আমি সকলের ছোট"। যাবতীয় বস্তুতেই পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে বহুত্ব রহিয়াছে—কেবল আমি সকলের ছোট, আমাতে বহুত্ব নাই, একত্ব ধর্ম্ম বই আমাতে আর কোন ধর্ম্ম নাই। আশ্রয়-বিষয়-বিভাব মিলনাত্মক একত্ব যাহাতে থাকিবে—অই আপনাকে আপনি আস্বাদন করিবার সাধ তাহাতে থাকিবেই। একক তিনি, তাই একত্ব তাঁহাতে নিত্যকালই আছে, ফলবলাৎ ঐ আপনাকে জানিবার ইচ্ছাও তাঁহার চিরন্তণী। তাহাই বলিতেছেন—'অমৃতচ্ছন্দ'

মানুষের ইচ্ছা (willing) মাত্রই মনের কর্ম্ম। যাহা কর্ম্ম, তাহাই কার্য্য—তাহাই কারণজন্য। জন্য হইলেই প্রধ্বংসী। তাই আমাদের মন সংকল্পবিকল্পাত্মক; ক্ষণে ক্ষণে একটি ইচ্ছার পরে আর একটি ইচ্ছার জন্ম হইতেছে, পর পরক্ষণে তাহাদের মৃত্যু ঘটিতেছে। কিন্তু, এই যে অমৃত ইচ্ছার কথা বলা হইতেছে এ আমাদের ব্যষ্টি-জীবের মনের ইচ্ছা নহে, 'সর্ব্বসমষ্টিগত মনের (universal mind) ইচ্ছা। তাই তাহাতে বিরাম নাই, কদাপি পরিণাম নাই—অতএব কহিয়াছেন—অমৃতচ্ছন্দ। মর জীবের ক্ষণিক ইচ্ছার সঙ্গে তাঁহার এই ইচ্ছার ভেদ স্পষ্ট প্রদর্শনোদ্দেশ্যে 'অমৃত' পদটিকেই বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নতুবা নিত্য বা

শাশ্বত বলিলেই কাজ চলিত। অতএব এস্থলে অমৃত পদের প্রকৃষ্ট প্রতিশব্দ 'অমরণধর্ম্মী'।

এইবার এই ইচ্ছার ধারাটি বুঝিবার চেষ্টা করিব নতুবা চন্দ্রপাত বুঝিবার উপায় কোথায়? সর্ব্বসমষ্টি তিনি—তাঁহাতে সবই রহিয়াছে কিন্তু থাকিলে কি হইবে? তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন—তিনি চাহেন—তাঁহাকে সর্ব্বত্র রাখিতে, —রাখিয়া দেখিতে। ভাই, তুমি কবি, তোমাতে কবিত্ব রহিয়াছে, তুমি কি তাহাতে সুখী হইতে পার—ভাই শিল্পী, তোমাতে শিল্পকুশলতা রহিয়াছে, তুমি কি তাহাতে সন্তুষ্ট হও—তোমরা সতত চাহ তোমাদের ঐ শিল্পকলা কবিতাকে—মূর্ত্তিমতী করিয়া বাহিরে দেখিতে। যাহা তোমাতেই রহিয়াছে—তাহাতে সুখ নাই—তাহাকে বাহিরে দেখিতেই সুখ।

চাঁদমণি বন্ধু আমার "শিশু"—তিনি সকলের বড়—তাহা হইতে বড় আর কিছুই নাই—তাই তিনি সকলের ছোট, "পরম শিশু" তাই কহিয়াছেন "আমি সকলের ছোট"।

"আমাকে শিশু কহে।" সকল তত্ত্বের তিনি সার—সকল ভাবের তিনি আদি, সকল রসের তিনি মূল, সকল মাধুর্য্যের তিনি উৎস—তাই তিনি "শিশু"। শিশু চাহিলেন আপনাকে বিশ্বের সর্ব্বত্র দেখিতে। কোমলের যেটুকু কমনীয়তা—মধুরের যেটুকু মধুরতা—যেইটুকুই তাঁর; সেইটুকুই তাঁর শিশুভাব। ঐ ফুলটির মধ্যে বসিয়া যে বস্তুটী

মানুষের মন হরণ করিতেছে, ঐ পূর্ণশশীর হাসির মধ্যে মিশিয়া যে মানুষের চক্ষু জুড়াইতেছে—মৃদুলমন্দ মলয়ের হিল্লোলে যে অমিয়পরশ আসিয়া মানুষের বুকের জ্বালা নিভাইয়া দিতেছে—সেইটুকুই শিশুভাব। বিশ্বের যাবতীয় সৌন্দর্য্যের মূলে যাহা বিরাজ করে তাহাই শিশুভাব। এই সন্তপ্রস্ফুটিত উৎপলটি হইতে শিশুসুলভ মাধুর্য্যটুকু যদি লইয়া যাই, তবে একটা কাগজের কৃত্রিম ফুলের সঙ্গে উহার কোন পার্থক্য থাকে কি? মানুষের হৃদয় যে মানুষকে আকর্ষণ করে—সেই আকর্ষণের স্বরূপ শিশুভাব। এইরূপে মায়াতীত চিন্ময়রাজ্যের যাবতীয় লাবণ্যের মূল প্রস্রবন—শিশুভাব। অই যে কুঞ্জবনে কালাচাঁদ কমলিনীর কোলে কেলি-কৌতুকে মাতোয়ারা সেই রসসৃষ্টির মূলে শিশুভাব। অই যে গৌড়াঙ্গনে গোরাশশী প্রেমের গড়া নিতাইচাঁদের গলাটি জড়াইয়া ভাবসিন্ধু মাঝে আপনাহারা—সেই অমৃত বৃষ্টির মূলে শিশুভাব। আর এই সমষ্টীভূত শিশুভাব মাধুরীর ভোক্তা যিনি তিনি পরমশিশু—শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর। এই সামগ্রীভূত শিশুভাবই "অমিয়চুমী" তাহাই মহাউদ্ধারণ রস, তাহারই রূপান্তর মহানাম। তিনি নিখিল বিশ্ব চরাচরে শিশুভাব প্রকটন করিয়া—মহানাম দ্বারে তাহাদের সঙ্গে রমণ করিতে চাহিতেছেন। ইহাই মহাউদ্ধারণ ব্রত—ইহাই অমৃতছন্দ। এইজন্যই চন্দ্রপাত। এই শিশুভাবের অপ্রাকৃত

লাবণ্যধারা ক্ষরণে অনন্ত জগতে অনন্তানন্তময়ের লীলাকলা অসীম অফুরন্তরূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই সন্তত প্রবহমানা লীলা নিত্যকাল হইতেছে। এই যে সূর্য্য উঠিতেছে, বায়ু নাচিতেছে, চাঁদ হাসিতেছে, ফুল ফুটিতেছে, এই যে বাৎসল্যময়ী জননী কত আদরে জীবন-দুলালের মুখখানি চুম্বন করিতেছে, এই যে গলা জড়াইয়া দুটি' সখা প্রাণ খুলিয়া বিজনবনে বেড়াইতেছে ; এই যে দয়িতের বুকে বুক রাখিয়া ভানুদুলালী প্রেমের টানে ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিতেছে—এ আর কিছুই নহে, সেই শিশুভাব লাবণী আপনাকে বিকাশ করিতেছে।

তৈত্তিরীয়োপনিষদের ঋষিও তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন—

• "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ'

'কেবা শরীর চেষ্টা করিত কেবা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দস্বরূপ না থাকিত।' এই লাবণ্য ক্ষরণে নিখিল চরাচর সঞ্জীবিত—কিন্তু নিতান্ত বহির্মুখ স্বরূপবিচ্যুত মূঢ় বদ্ধকীট যারা তারা এ আনন্দ আস্বাদনে বঞ্চিত। তাই বুঝি তাহাদের জন্য মাঝে মাঝে লাবণ্যের উচ্ছ্বাস হয়। তাহাই বলিতেছেন—

'সে লাবণী উচ্ছ্বাসে কীট-মোক্ষণ'

উচ্ছ্বাস অর্থ উচ্ছলন, স্ফীতি। কিজানি কোন্ অজানা

কারণে সেই রসমাধুর্য্য উছলাইয়া উঠে। তখন বুঝি নিত্যধামে তাহার আর স্থান সঙ্কুলন হয় না—তাই—

"মাটীতে চাঁদ উদয় ভেল"

চাঁদমণি বন্ধু তখন প্রপঞ্চের ধূলায় আসিয়া উদিত হয়েন। আর তৎসহ মহাউদ্ধারণ রস মহানামরূপে আপনাকে পরিব্যক্ত করেন। অতএব এই কীর্ত্তনসহ কীর্ত্তনানন্দরূপী বন্ধু সুন্দরের প্রকাশ—ইহাই লাবণী উচ্ছ্বাসের স্বরূপ। কীট-মোক্ষণ তাহার ফল। কিপ্রকারে কীটের মোক্ষণ হয় শীতল পদের ভাষ্যস্থলে তাহা উক্ত হইয়াছে।

তথাপি পুনরাবৃত্তি করিতেছি। প্রত্যেক জীবের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের যে স্বরূপটী তাহা শিশুভাবময়। সংসারের যাবতীয় নর নারীর অন্তরের মূর্ত্তিটি গোপী বা মঞ্জরী ইহা শ্রীবৈষ্ণব সিদ্ধান্ত। মহাউদ্ধারণ-সিদ্ধান্ত ইহা হইতে একটু নূতন। কিন্তু নূতন হইলেও তাহা পুরাতনের ব্যাঘাতক বা পরিপন্থী নহে। মঞ্জরীতত্ত্ব খণ্ডনের উপর শিশুতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা নহে। গোপী দেহেরও অন্তরালে—শেষ আন্তর-দেহরূপে শিশুমাধুরী, ইহাই মহাউদ্ধারণ সিদ্ধান্ত। যেমন এই ভৌতিক জগতের শেষ উপাদান কি? এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে কিছুদিন পূর্ব্বে প্রায় সকল বৈজ্ঞানিকগণ একবাক্যে পরমাণুর নাম করিতেন। তদপেক্ষা আবার সূক্ষ্মতর কিছু থাকিতে পারে ইহা বিজ্ঞানবিদ্ চিন্তা করিতেন না। কিন্তু এই নব-

শতাব্দীর উন্মেষ হইতে বিজ্ঞান জগতে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। আজকাল পরমাণুকে একটা ছোট খাট সৌরজগৎ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অত সূক্ষ্ম বস্তু পরমাণুর মধ্যে যে ইলেকট্রন্ (electron) নামক মহাশক্তির যুদ্ধ হইতেছে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। এখন যদি কেহ মনে করেন পরমাণুকে অস্বীকার করিয়া ইলেকট্রন্ বাদ স্থাপিত হইতেছে। কোনও একটা বস্তুর অংশের অংশ করিলে এখন আর পরমাণু পাওয়া যাইবে না। এইরূপ ভাবিলে কিন্তু ভুল হইবে। বস্তুর ক্ষুদ্রাংশ পরমাণু, ইহা সত্য, কে ইহার অন্যথা করিবে। ইলেকট্রন্ পরমাণুকে অস্বীকার করে নাই। কারণ পরমাণুকে স্বীকার না করিলে ইলেকট্রনের বাসাবাড়ীই যে উচ্ছন্ন যাইবে। ইলেকট্রন পরমাণুকে অবশ্যই মানিয়াছেন, মানিয়া পরমাণুর সূক্ষ্মতমত্বকে খণ্ডন করিয়াছেন। ঠিক তদ্রূপ মহাউদ্ধারণ সিদ্ধান্তিত শিশুভাব মাধুর্য্যের প্রতিষ্ঠা গোপীভাবের অস্বীকারে নহে, গোপীভাবের চরমত্বের অনঙ্গীকারেই তাহার তাৎপর্য্য পর্য্যবসিত।

এ সকল ভাবরাজ্যের অনুভূতির কথা। স্থূলজগতের কথাবার্ত্তায় বা কাগজকলমে ইহার সুমীমাংসা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। জড়-জগতে সেখানে অণুপরমাণু বা প্রোটাইল ইলেকট্রনের স্থান ভাবরাজ্যে সে স্থান কাহার ইহাই আলোচ্য বিষয়। এই বিশ্বে অনুভব-যোগ্য যাবতীয়

ভাবের আদি বীজ-স্বরূপ ভাবটি কি? আপনি সেটিকে গোপী বা মঞ্জরীভাব বলুন, তাহাতে আমার আপত্তি না থাকিলেও, জগতের অন্য অনেক লোকের আপত্তি উঠিতে পারে। কিন্তু আমি যদি সেই মঞ্জরীরও অন্তর্নিবিষ্ট ভাবটীর মূলকে শিশুভাব বলি, তাহাতে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিতে পারে না। যেমন ত্রৈরাশিকের অঙ্ক কষিবার কালে আমরা অজ্ঞাত চতুর্থ সংখ্যাটিকে X ধরিয়া লই, তদ্রূপ অপরিজ্ঞাত সেই আদি ভাবকে শিশুভাব ধরিলে তো কোন প্রকার ভ্রমের সম্ভাবনা দেখি না। বরং যাহা হইতে বিকাশ হইতেছে তাহাকে শিশু ভাব বলাই অধিকতর সদ্‌যুক্তি পরিপূর্ণ। অঙ্ক কষা ঠিক ঠিক ভাবে হইয়া গেলে যেমন X এর স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পরে সেইরূপ প্রকৃষ্ট রূপ মহানাম সাধনা দ্বারা হৃদয় উন্মুখ হইলে শিশুভাব স্বরূপ ফুটিয়া উঠিবে।

"গোপী" বলিতে যেমন বাজারের যে কোন গোয়ালার রমণীকে বুঝিলে চলিবে না, তদ্রূপ শিশু অর্থে পথের যে কোনও একটী খোকাকে বুঝিলে হইবে না। "গোপী" বলিলে যেমন কৃষ্ণ-গতপ্রাণা সেই ব্রজধামবাসিনী অপরিণত বয়স্কা সরলা নির্ম্মলা কামগন্ধ-বিনির্মুক্তা গোপবালাগণকে বুঝিতে হইবে, তদ্রূপ "শিশু" বলিলে আপনি বুঝুন—

"কৃষ্ণ নামের বহু অর্থ তাহা নাহি মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এইমাত্র জানি॥"

"শিশু" শব্দে আপনি বুঝুন, সেই তরুণ-তমাল-দ্যুতি যশোদা স্তনন্ধয় ; 'পরম শিশু'বলিলে আপনি ভাবুন, সেই তপ্ত-হেমকান্তি শচীরদুলাল নিমাইচাঁদ, 'পরমাতিপরম শিশু' বলিলে আপনি দেখুন অই উজ্জ্বল রসসাগরমথিত নবনীততনু শ্রীবামাদেবী অঙ্কশায়ী শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দর। তখন আর আপনার বুঝিতে অসুবিধা হইবে না, শিশুভাবকে কেন সকল ভাবের আদি মূল বলিয়াছি। সেই শিশুর আস্বাদনীয় যে রস তাহাই মহাউদ্ধারণরস, ভক্ত কৌতুক করিয়া তার নাম রাখিয়াছেন "অমিয় চুষী" এসব কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই রসের ছিটা-ফোটা বিশ্বের সর্ব্বত্রই আছে। আপনি আমি ঐ এক ফোটার উপর প্রতিষ্ঠিত আছি বলিয়াই জীবপদবাচ্য হইয়া ধরার বুকে নাচিয়া কুঁদিয়া আনন্দ লুটীতেছি।

কাল কলি পাপ প্রপঞ্চবশে ঐ ভাব হইতে যে যতখানি দূরে গিয়াছি ঐ ভাবটিকে যে যতখানি হারাইয়াছি ; ঐ শিশুরসের আস্বাদন হইতে যে যতখানি বঞ্চিত হইয়াছি,সে সেই অনুপাতে কীটত্বের বোঝা মাথায় বহিতেছি। এই কীটত্ব হইতে মোক্ষণ বা নিষ্কৃতি পাইলেই সর্ব্বত্র শিশু-ভাবের রাজত্ব বসিবে। তখনই মহাউদ্ধারণ রসনায়কের মহাউদ্ধারণ ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে। এই কীট মোক্ষণের উপায় 'লাবণী উচ্ছ্বাস'। এই উচ্ছ্বসিত লাবণ্যের সঙ্গে মোক্ষণের সম্বন্ধ কিরূপে হয় তাহা অবশ্যই জানিতে হইবে। মহানাম মহাউদ্ধারণ রসের স্বরূপ। যেমন

আলোড়িত দুগ্ধ হইতে নবনী উত্থিত হয়, তেমনি উচ্ছ্বসিত লাবণী হইতে যে অভিনব বস্তুটি উঠে, তাহাই "মহানাম"। যে রসের একটি কণাতে স্থিত বলিয়া জীবলোক সঞ্জীবিত, সেই রসসাগরের ঘনীভূত-স্বরূপ "মহানাম"। ক্ষুদ্র জলাশয় নদী নালা প্রভৃতি অবিরত সাগরের অভিমুখে প্রধাবিত হয়, কারণ সাগরের সঙ্গে মিশিতে পারিলেই তার অসীমে আত্মসমর্পণ হয়, জীব সেই অপার মাধুরীর একটি বিন্দু। তাহাকে ছুটিতে হইবে মহানাম সিন্ধুর দিকে। কারণ ঐ সিন্ধুতে মেশা, আর অনন্তানন্তময়কে আস্বাদন করা, একই কথা। ইহাই জীবের পরমপ্রেয়ঃ, ইহাই জীবের চরমশ্রেয়ঃ; ইহাই সর্ব্বশেষগতি ইহাতেই তৃষিত জীবের চিরপরিতৃপ্তি।

এই উপেয়কে লাভ করিবার উপায় কি? এখানে আবার একটা মজা আছে। যাহা উপায়, তাহাই উপেয়—ইহা বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই প্রকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য। মহানাম সিন্ধুতে মিশিতে হইবে—উপায়,—

"একটি মহানাম সংকীর্ত্তন"
"এক উচ্চারণকে সংকীর্ত্তন কহে"

এই উচ্চারণে সংকীর্ত্তনে কি হইবে?—"উচ্চারণে ভাব হয়" "সংকীর্ত্তনে রাগ হয়", ভক্ত তাহাই লিখিতেছেন—

"আব্রহ্মস্তম্ব ভাববাগরাঞ্জিত"

শ্রীশ্রীমহানাম উচ্চারণে জীব জগতের সর্ব্বত্র শিশুভাবের বিকাশ হইতেছে ও পরম শিশুর সঙ্গে অহর্নিশি বিহারে ও সেবানুরাগে রঞ্জিত হইয়া ব্রহ্ম হইতে অণুপরমাণু পর্য্যন্ত স্বরূপে স্থিত হইতেছে। নিখিলবিশ্বপ্রপঞ্চ ভাবরাগময় সন্দর্শন করিয়া অবশেষে ভক্ত দৈন্যোক্তি দ্বারা নিজের কথা প্রকাশ করিতেছেন।

"মহীন্দির যে কীট সে কীট শেল।"

নিজে সে কীট, এমনই কীট, যে তাহার কীটত্ব শেলের মত কঠোর। এত চাঁদের সুধায় স্নাত হইয়াও তাহার কঠোর কীট-স্বভাব দূরীভূত হইল না। এইভাবে ভক্ত নিজ দীনতা জানাই-তেছেন। বাগেদবী সরস্বতী তাহাতে দুঃখিতা হইয়া ঐ পদেই ভক্তের স্তুতি করিতেছেন।

তৈছে শ্লোকে তোমার অর্থে নিন্দা আইসে।
সরস্বতীর অর্থ শুন যাতে স্তুতি ভাসে॥"

শ্রীচরিতামৃত, অন্ত্য ৬ষ্ঠ।

দীন ভক্ত বলেন, শেল অর্থ শেল নহে শেলের মত কঠিন। সরস্বতী বলেন, শেল অর্থ শেলই বটে, তবে কীট অর্থ কীট নহে, কীটত্বে লক্ষণা। ভক্তবর! বস্তুতঃ তুমি অকীট। আজ বিন্দু বলিয়া জল মাধুর্য্যসিন্ধু ছড়াইলে তাহা কীটের সাধ্যায়ত্ত নহে।

তথাপি তুমি যে কীটের সাজে নিজেকে সাজাইয়া রাখিয়াছ এই ছদ্মবেশের হেতুটি কি? তোমার

অভিসন্ধি কি? এই যে বাগ্দেবী আমি ব্যক্ত করিতেছি। তুমি কীট-শেল। তুমি কীটত্বের শেল হইবে। তুমি কীটত্বকে চিরতরে জগৎ হইতে ধ্বংস করিবে, তুমি এই চন্দ্রপাত মাধুর্য্য ছড়াইয়া নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ জাগাইয়া তুলিবে, তুমি জীবের সর্ব্বপ্রকার মালিন্য দূর করিয়া দিয়া পরম শিশুর শ্রীচরণে সমপণ করিবে, তাহাই মনে. মনে অভিসন্ধি করিয়া কীটের সাজে সাজিয়া ছদ্মবেশী মহানাম-ভিক্ষু তুমি জীবের দুয়ারে করপুটে দাঁড়াইয়া গাহিতেছ,—

"ভিখারী এক তোদের দুয়ারে,
চাহেনা সে যে অন্য কিছু দান।
শুধু ক্ষণেকের তরে গাহিতে যে চায়
পরমেশের শুভ আগমনী গান॥

ছিছি দিবাভাগে রাত্র দ্বিপ্রহরের মত,
দেখিস্ অলস শয়নে স্বপ্ন অবিরত;
মোহনের মধুর মুরলীর তান
শুনেও শুনিস্ না এমনি বধির কাণ॥

উঠ উঠ জাগ ওভাই ভগিনী,
হের সূরয সম্ভাষে হাসে সরোজিনী;
পরিমল লোভে অলিকুল জু'টে,
নাচা'য়ে তুলেছে জগৎখান॥

মলয়ানিলপরশে তটিনী হাসিয়ে,
নীলিমা বসন অঞ্চল দোলা'য়ে ;
সারস মরাল সংহতি মরি
গরবিনী গাহে কুলুকুলু তান ॥

কি আনন্দ আনন্দ আনন্দের মেলা,
নৃলোক শ্মশানে নিকুঞ্জের খেলা ;
সোণার গৌর বন্ধু গোপাল নেলা ভোলা,
ভালবাসার মোয়া দিয়ে কাড়ে মনপ্রাণ ॥

মতিচ্ছন্ন বলে ঘৃণা না করিস্,
আয় ছুটে আয় ত্যজিয়ে আলিস্ ;
দুঃখের নাহি ডর সুখ দিয়ে গড়া
আনিয়াছে মহানাম পুষ্পযান ॥”

ইতি—শ্রীমহানাম মধুভাষ্য নামক চন্দ্রপাত মাধুর্য্যবিন্দুর ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমাপ্ত ।

সমর্পণ।

শ্রীবন্ধুরিন্দুসন্নিভঃ প্রেমাকাশ-প্রকাশকঃ।
তচ্চন্দ্রিকাপানোন্মত্তং শ্রীগুরুং সংপ্রপদ্যে॥

দেব!

তোমারি আজ্ঞা শিরে লইয়া—তোমারি কৃপাবলে তোমারি শ্রীলেখনী-প্রসূত তত্ত্বকথার ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি। সুন্দর হউক অসুন্দর হউক তোমারি শ্রীচরণে সমর্পণ করিলাম।

আমি, তোমারি পদাশ্রিত,—**জনৈক ভৃত্য।**

সমাপ্ত।

অমিয় চুষী পরিচয়ে—

"একান্ন রাগ প্রসবিনী"

[মধুভাষ্য ৩১ পৃঃ]

(পরিশিষ্ট)

রাগের সাধারণ লক্ষণ এই যে,—

যোইয়ংধ্বনি বিশেষস্তু স্বরবর্ণ বিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ কথিতো বুধৈঃ ॥

শ্রোতার চিত্তকে রঞ্জিত করে বলিয়াই রাগ। রাগ তিন প্রকার। পূর্ণ, ষাড়ব, ঔড়ব।

স চ রাগ স্ত্রিধা পূর্ণ-ষাড়বৌড়ব ভেদতঃ।

সাতটী স্বরে পরিপূর্ণ হইলে পূর্ণ, ছয়স্বরে 'পূর্ণ' হইলে 'ষাড়ব'। পাঁচস্বরে পূর্ণ হইলে 'ঔড়ব'। এই রাগ সমূহকে প্রথমতঃ দুই ভাগ করা যায়। যাহা গীতাদির স্বরে স্থাপিত থাকে তাহাকে "গ্রহ" বলে এবং যাহা গানের সমাপন সাধন করে তাহাকে 'ন্যাস' বলে। এই ছয় প্রকারের প্রত্যেক আবার ৫ ভাগে বিভক্ত শুদ্ধ, সালগ, সংকীর্ণ, জী[illegible]। এই প্রকারে রাগের সংখ্যা ত্রিশ হইল। প্রথমোক্ত পূর্ণ রাগ পুনরায় ২১ ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বে বলিয়াছি সাতটি স্বরে পূর্ণ হইলে তাহাকে 'পূর্ণ' বলে। এই স্বর ও পূর্ণ রাগের একবিংশতি ভেদ বুঝিতে হইলে একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। মহাকবি মাঘ

শিশুপালবধ কাব্যে প্রথম সর্গে দশম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সদনে দেবর্ষি নারদের আগমন বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

রণদ্ভিরাঘট্টনয়া নভস্বতঃ
পৃথগ্বিভিন্ন শ্রুতিমণ্ডলৈঃ স্বরৈঃ।
স্ফুটীভবদ্ গ্রাম বিশেষমূর্চ্ছনাং
অবেক্ষমানং মহতীং মুহুর্মুহুঃ॥ ১।১০

এই শ্লোকের টীকায় মহামহোপাধ্যায় মল্লিনাথ রত্নাকরের বচন তুলিয়া স্বরগ্রাম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এখানে তাহারই সারসঙ্কলন করিব। যাহারা অনুসন্ধিৎসু তাহারা মূলগ্রন্থ দেখিয়া লইবেন।

কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতি বা করতলদ্বয় পরস্পর আঘাতজন্য বায়ুর সঞ্চালনই শব্দ। সঙ্গীতবেত্তাগণ বলেন যে, যখন ঐ শব্দতরঙ্গের সঙ্গে কর্ণ-সংযোগ হয় তখন প্রথমে ঐ শব্দের কেবল পূর্ব্বউৎপত্তি মাত্র হ্রস্বভাবে শুনা যায়। এই হ্রস্বাবস্থার নাম 'শ্রুতি'। এই শ্রুতিই স্বরের আকৃতি। তারপর সেই শ্রুতির অব্যবহিত পরেই অনুবর্ণাত্মক অর্থাৎ রণ্ রণ্ এইরূপ একটী কর্ণরসায়ণ স্নিগ্ধ স্বন অনুভূত হয়। উহা শ্রোতার হৃদয়কে একেবারে তদনুরক্ত করিয়া তোলে, সুতরাং তাকে 'স্বর' কহে। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সাতটি স্বরই 'শ্রুতি' হইয়া থাকে। ইহাদিগকে সংক্ষেপে বলিবার জন্য একটি সঙ্কেত আছে—যথা—স রি গ ম প ধ নি। বাঙ্গালাতে ও হিন্দীতে সা রে গা মা পা ধা নি এইরূপও বলিয়া থাকে। গজশব্দকে নিষাদ গাভীর শব্দকে ঋষভ, ছাগশব্দকে গান্ধার, ময়ূরধ্বনিকে ষড়জ, বকের শব্দকে মধ্যম, অশ্বের ডাককে ধৈবত ও বসন্তকালীন কোকিলের কলনাদকে পঞ্চম বলা যায়। যেমন কতকগুলি আত্মীয় স্বজন পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া একটি পরিবারে

বাস করে, তেমনি এই সাতটি স্বর একত্র হইয়া 'গ্রাম' নামে কথিত হয়। ঐ গ্রাম তিন প্রকার যথা—ষড়জগ্রাম, মধ্যমগ্রাম, ও গান্ধারগ্রাম। এই প্রত্যেক গ্রামকে আবার তিন তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। এই বিভাগের হেতু সাতটি স্বরের আরোহ ও অবরোহ। আরোহ অর্থ উদ্গতি, অবরোহ অর্থে অধোগতি। চলিত কথায় নামান ও উঠান বা হিন্দি ভাষায় জিল ও খাদ। যেমন সা রে গা মা পা ধা নি এইগুলি উঠান এবং নি ধা পা মা গা রে সা এইগুলি নামান। সঙ্গীতজ্ঞগণ এই প্রক্রিয়াকে মূর্চ্ছনা কহেন। মূর্চ্ছনা এক এক গ্রামে তিন তিনটি করিয়া অবস্থিত হয়। সুতরাং মূর্চ্ছনার সংখ্যা একবিংশতি। এই মূর্চ্ছনার একবিংশতি ভেদ আশ্রয় করিয়া পূর্ণরাগ একবিংশতি প্রকার হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ত্রিশ ও এই একবিংশতি সর্ব্বসাকল্যে একান্ন প্রকার রাগের ভেদ লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় শ্রীশ্রীপ্রভু **"একান্নরাগে মহাউদ্ধারণ গান করিতে হয়"** এইরূপ সূত্র রচনা করিয়াছেন। আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রানুসারে ঐ একান্নপ্রকার রাগে মানুষের অধিকারই হইতে পারে না। "গান্ধারঃ সপরীবারো গ্রামস্তু দিবি গীয়তে" গান্ধার গ্রামে গন্ধর্ব্বকিন্নর ও দেবগণেরই অধিকার। শ্রীশ্রীপ্রভু একান্নরাগে মহানাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা দিয়া কি মনুষ্য লোককেও গান্ধারাদি গ্রামে অধিকার পাইবার আশীর্ব্বাদ করিলেন অথবা দেবাদিরও মহানামে অধিকার প্রদান করিলেন তাহা বুঝিতে পারিনা। আমরা জানি লীলাস্বাদনে দেবদেহ বঞ্চিত "মুক্তাইপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে"— শ্রীব্রহ্মসূত্রের এই বাক্যই তাহাতে প্রকৃষ্টপ্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলারস পান করিতে হইলে দেবগণকেও মানুষ হইয়া আসিতে হয়। 'নরতনু ভজনের মূল' এই বাক্যও ঐ তত্ত্ব ইঙ্গিত করে। এবার মহাউদ্ধারণ লীলায় মহানামে হয়তো বা দেবদেহধারী মুক্তগণেরও অধিকার দিয়াছেন,